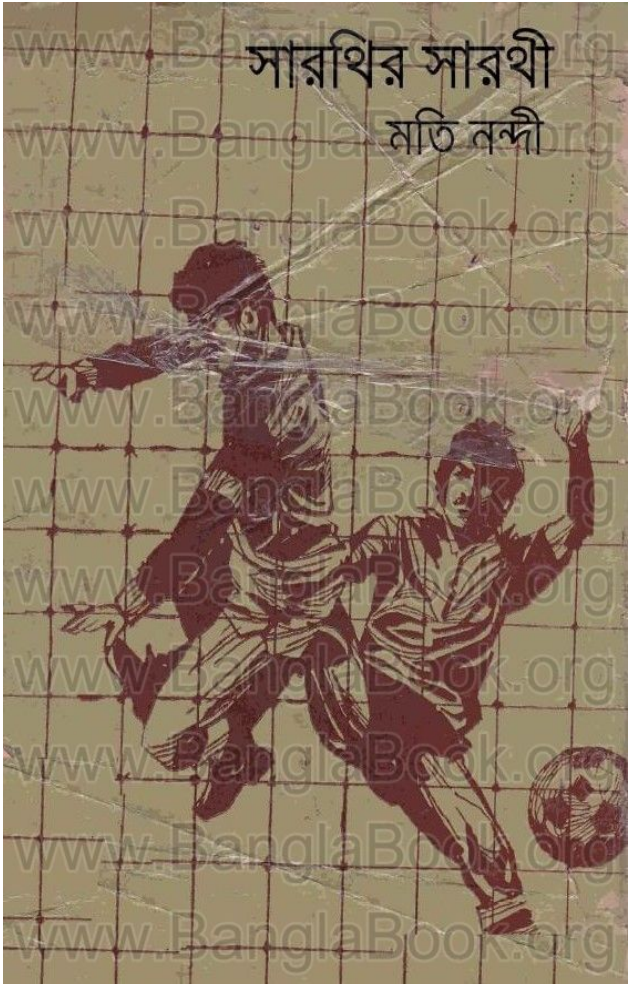

www.BanglaBook.org

।। এক ।।

"অ্যাঁ, একি!" জ্যোতি আধশোয়া থেকে সিধে হয়ে বসল বিছানায়, খবরের কাগজটা ইঞ্চি চারেক এগিয়ে আনল চোখের কাছে। যেন কাছে আনলেই খবরের সত্যতা আরো ভাল করে যাচাই করা যাবে। মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারছে না। অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে ক্রমশ এগিয়ে এসে আবার ফুটে যাচ্ছে সর্ষেদানার মত ছোট হয়ে। তিন চার বার এমনটি হল।

জ্যোতি অন্যমনস্কর মত ডানহাতটা পাশে বাড়াল। হাতের ধাক্কায় নীচু ত্রিপদে রাখা চায়ের কাপটা ছিটকে মেঝেয় পড়তেই সে চমকে তাকাল। কাপটা ভাঙেনি। কোনদিন এমনটা হয় না। আঙুলগুলো অব্যর্থভাবেই কান ধরে কাপটাকে তুলে মুখের কাছে এনে দেয়।

"কি হল জ্যোতি, কি ভাঙল রে?"

ঘরের বাইরে থেকে আশালতা চেঁচিয়ে উঠলেন।

"কিছু না।" অধৈর্য, রুক্ষ স্বরে সে জবাব দিল।

"আজ বাজার যাবি নাকি? কাল যে বললি, এক বেঘৎ লম্বা কই মাছ নিজে গিয়ে কিনবি?"

জ্যোতি কথাগুলোকে গ্রাহ্যে না এনে খবরের হেডিংটা আবার পড়ল—**পতিতাগৃহ থেকে ধৃতদের মধ্যে ফুটবল কোচ।**

তার নিজের ষাট বছর বয়সী বাবা বলাৎকার করে ধরা পড়েছে, এমন একটা খবর যেন সে শুনল, জ্যোতি সেই রকমই বিমূঢ় বোধ করছে। অবিশ্বাস্য, তার কাছে একদমই অবিশ্বাস্য যে অরবিন্দদা, যিনি তার বাবার থেকে দশ বছরের ছোট, রিপন স্ট্রীটে এক বেশ্যাবাড়িতে যেতে পারেন।

আদালতের সংবাদদাতার খবরটায় বিশেষ বিস্তারিত নেই। অরবিন্দদা কোন্ ক্লাবের কোচ তারও উল্লেখ নেই। শুধু বলা হয়েছে—রিপন স্ট্রীটে জনৈকা মিসেস সিকুয়েরার বাড়িতে বুধবার রাত্রে পুলিশ হানা দেয়। সেখানে বন্ধ ঘর থেকে অশালীন অবস্থায় পাওয়া চারজোড়া নারী ও পুরুষকে পাকড়াও করে তারা থানায় নিয়ে যায়। ধৃতদের মধ্যে আছে এক ফুটবল কোচ অরবিন্দ মজুমদার। পুলিশ গৃহকর্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করা হয়। ব্যক্তিগত জামিনে তারা ছাড়া পেয়েছেন।

আজ শুক্রবার। অরবিন্দদা এখন নিশ্চয়ই বাড়িতে। বাড়ি মানে সল্ট লেকে দু' ঘরের ফ্ল্যাট। অরবিন্দদা আর প্রভাতী বৌদি। সন্তান নেই। গত চোদ্দ বছর ধরে বৌদি পক্ষাঘাতে বিছানায়। জ্যোতি বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সে ঠিক করে উঠতে পারছে না, এখন কি করবে। ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে এখন তার যত নামডাক, প্রতিষ্ঠা, তার কিছুই হত না যদি সে সাত বছর আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে অরবিন্দদার ফ্ল্যাটে গিয়ে একদিন না দাঁড়াত।

ঠিক এই সময়ে কি অরবিন্দদার মুখোমুখি হওয়া উচিত? সামনে দাঁড়ান কি সম্ভব? দাঁড়ালে ওঁর কি হবে জানি না কিন্তু নিজেরই লজ্জা করবে। বস্তুত সল্ট লেক থেকে টিটাগড়, অন্তত ষোল-সতেরো কিলোমিটার দূরে নিজের ঘরে একা, তবু সে অদ্ভুত একটা লজ্জার মধ্যে নিজেকে নিয়ে বিপন্ন বোধ করছে। বুকের ভিতরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। অরবিন্দদা কিনা শেষকালে···।

কিন্তু খবরের কাগজে অনেক তো ভুল খবরও বেরোয়।

"ছোটু, ছোটু।" জ্যোতি চেঁচিয়ে তার ছোটভাইকে ডাকল। বছর আঠারোর ছোটু আসতেই সে একটা পাঁচটাকার নোট তার হাতে দিয়ে বলল, "দৌড়ে যা, যে-কটা কাগজ পাবি, সব একটা করে কিনে নিয়ে আয়, জলদি, চটপট।"

"কিন্তু আমি যে এখন—।"

"যা বলছি।" এত জোরে চীৎকার এ-বাড়িতে জ্যোতি আগে কখনো করেনি। ছোটুর হাতটা কেঁপে গেল।

"কটা কাগজ আনব?"

"পাঁচটা, ছ'টা, যে কটা হয়।"

ছোটু আর কথা বাড়াল না। আশালতা ঘরে এলেন।

"কি হল, চেঁচিয়ে উঠলি কেন? ওমা, চায়ের কাপটা যে—" কাপটা তুলে নিয়ে তিনি ন্যাতা আনতে বেরিয়ে গেলেন। জ্যোতি জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। জানালার পাশেই ছোট্ট একটা পুকুর। তার ডানদিকে একতলা পাকা বাড়ি। সাত বছর আগে বাড়িটা কিনে, মেরামত করে বসবাস করছে একটি পরিবার। জ্যোতি ওদের কাউকে চেনে না, নাম পর্যন্ত জানে না।

গত সাত বছর নিজের বাড়ি, বাবা-মা, ভাইদের সঙ্গে জ্যোতির সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। ভাইয়ের হাত দিয়ে সে মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছে। আশালতা দু'বছর আগে চিঠিতে একটা ফিরিস্তি দিয়েছিলেন, বাড়িটার জন্য কি কি করতে হবে। জ্যোতি তার পরের ভাই লাটুকে মুখেই বলে দিয়েছিল, এই বাড়িতে থাকার

www.BanglaBook.org

কোন ইচ্ছেই তার নেই। সুতরাং মুখে রক্ত তুলে ফুটবল খেলে যে টাকা আয় করছে, সেই টাকা এই বাড়ির পিছনে সে ঢালবে না। তাছাড়া বাড়িটাও তার নিজের নয়, বাবার। অন্য ছেলেদেরও অংশ আছে। সে একা টাকা খরচ করে দোতলা তুলবে আর অন্য ভাইয়েরা ভোগ করবে, তা হতে পারে না। একটা কথা শুধু সে বলেনি, মিনিস্টারকে ধরে পাতিপুকুরে সে পাঁচ কাঠার সরকারী প্লট কিনেছে। সেখানেই নিজের বাড়ি করবে।

একটা লীগ ম্যাচের পর ক্লাব তাঁবুর বাইরে চেয়ারে বসে দুই ভাই কথা বলছিল। লাটু চুপ করে মেজদার কথাগুলো শুনে যায়, ঘাসের দিকে চোখ রেখে। জ্যোতিকে তার ভাইয়েরা মেজদা বলে। বড় ভাই কৈশোরে গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে। "আমার যা কর্তব্য আমি তা করেছি, করেও যাচ্ছি। তোকে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছি, মাসে ছশো টাকা এই বাজারে এমন কিছু খারাপ নয় ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া একটা ছেলের পক্ষে। ছোটুর পড়ার খরচ আমার। যতদিন পড়াশুনো চালাবে ততদিন চালাব। বাবা-মা যদ্দিন বাঁচবে আমি দেখব। মাসে মাসে হাজার টাকা দিচ্ছি···এরপর আর আমি কি করতে পারি? বাড়িটা দোতলা করে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছোটখাটো মেরামতি, নতুন পায়খানা, জলের কল, ইলেকট্রিক সবই তো করে দিয়েছি। তুই আর ছোটুই বাড়িটা ভোগ করবি, আমি ওখানে থাকব না। যা করার তোরা দুজনই করবি।"

সারথি সংঘে এসে জ্যোতি প্রথম বছরটা কাটিয়েছে ক্লাবের তালতলার মেসে, সাতটি খাট পাতা লম্বা ঘরটায়। দ্বিতীয় বছরেই দোতলায় উত্তরপ্রান্তের ঘরটা একা থাকার জন্য তাকে দেওয়া হয়, যখন শৈবাল মণ্ডল মোহনবাগানে সই করে সারথি ছেড়ে চলে যায়। জ্যোতির মত নবাগতকে একবছর খেলিয়েই পঁচাত্তর হাজার টাকা দেওয়া হবে শুনে স্টপার ব্যাক শৈবাল নব্বই হাজার চেয়েছিল। জেনারেল সেক্রেটারি সরোজ সেন রাজী হননি। বরং বলেছিলেন, "শৈবাল, এ বছর যা পেয়েছে, সেই পঁচাত্তরই দেব সামনের সিজনে, তাতে যদি থাকতে রাজী থাকে তো থাকবে, নইলে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কি যুগের যাত্রী যেখানে যেতে চায় যেতে পারে।" শৈবালকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে শুনে বিক্ষোভ, ঘেরাও, হাতাহাতি হয়েছিল। সারথির প্রেসিডেন্ট সন্তোষ ভট্টাচার্য আর ট্রেজারার কিরণ ঘোষের জোটের লোকদের সঙ্গে সরোজ সেন আর ফুটবল সেক্রেটারি চঞ্চল মৈত্র জোটের লোকেদের। যারা হাতাহাতি, খেস্তাখেস্তি করেছিল তাদের অবশ্য 'লোক' বললে ঠিক পরিচয়টা বোঝান যায় না। কলকাতার প্রত্যেক ফুটবল ক্লাবের কর্তা-

ব্যক্তিরা ক্ষমতা হাতে রাখার ও নানান ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য নিজস্ব দল পোষে।

ট্রান্সফারের সময় ফুটবলার গায়েব করা থেকে শুরু করে, গ্যালারিতে মারপিট, ক্লাবের বিপক্ষ গোষ্ঠীর পেটোয়া খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে সমর্থকদের উস্কে দিয়ে চড়-ঘুঁষির শিকার বানিয়ে নার্ভাস করে দেওয়া, সাংবাদিকদের অকথ্য নোংরা ভাষায় গালি-গালাজ করে যথার্থ রিপোর্ট লেখা বন্ধ করার চেষ্টা—এইসব কাজ করার জন্য অল্পবয়সী, বেকার, অশিক্ষিত, কিছু ছেলে পোষা হয়। এরা ক্লাবের সাফল্যের জন্য যে কোন কাজ করতে পারে, এমনকি প্রাণও দিতে পারে। ক্লাবের খেলা দেখার জন্য অবাধে মেম্বার গেট দিয়ে মাঠে ঢোকার পুরস্কারটুকু ছাড়া এরা আর কিছু পায় না। শৈবালকে নিয়ে ক্লাব যখন তপ্ত তখন সরোজ সেন শুধু একটা কথাই অরবিন্দ মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার এই জ্যোতির্ময় বিশ্বাস ছেলেটা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ঠিক তো? শেষকালে ডোবাবে না তো?" অরবিন্দ মজুমদার জবাব দিয়েছিলেন, "পঁয়ত্রিশ বছর মাঠে আসছি, খেলেছি সব কটা বড় ক্লাবে, কোচ করছি এগারো বছর, ভারতের হেন ট্রফি নেই যা আমি জিতিনি। কিছুটা ফুটবলার চেনার ক্ষমতা আমার হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জ্যোতি আপনাকে ডোবাবে না, ভাসাবে।" সেই মরশুমে মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ন হল কিন্তু একটি মাত্র ম্যাচই তারা লীগে হেরেছিল, সারথির কাছে দু গোলে। দুটো গোলই জ্যোতির। খেলার পর টেন্টে নিজের কামরায় জ্যোতিকে ডাকিয়ে এনে সরোজ সেন বলেন, "তোমার নাকি মোটর সাইকেল চড়ার খুব শখ?" অরবিন্দ মজুমদার তখন সেখানে বসে। মিটমিট হাসছিলেন। জ্যোতি তার এই শখের কথা একবারই শুধু অরবিন্দদাকে বলেছিল সিজনের প্রথম দিকে। সরোজদার কানে কথাটা তোলা তাহলে ওরই কাজ। "আমি কালই বুক করব, রয়্যাল এনফিল্ড, বুলেট। দু গোলের জন্য দু চাকার, যেদিন চার গোল দেবে মোহনবাগান কি ইস্টবেঙ্গলকে কি যাত্রীকে সেদিন চার চাকার গাড়ি…।"

সরোজ সেনের কাছ থেকে মোটর গাড়ি আর পাওয়া হয়নি। শেয়ার বাজারে হঠকারিতা করে তিনি এমনই ফাটকা খেলেছিলেন যে শুধু বিষয় সম্পত্তিই নয়, বিরাট অফসেট প্রেসও বিক্রি করতে হয়। এরপর তিনি সারথি সংঘের গেটে আর পা রাখেননি। হাওড়ায় বস্তির মত একটা অঞ্চলে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে এখন সপরিবারে আছেন।

জ্যোতি জানালার বাইরে থেকে চোখ সরাল। বুলেটটা উঠোনে হেলান দিয়ে

www.BanglaBook.org

রয়েছে স্টেপনিতে। গত পাঁচ বছর অবসর পেলেই এই প্রিয় বাহনটিতে চড়ে সে পশ্চিমবাংলা চষে বেড়িয়েছে।

একগোছা কাগজ হাতে ছোটু বাড়িতে ঢুকছে। দেখেই জ্যোতি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই কাগজগুলোতেও কি, ধৃতদের মধ্যে অরবিন্দ মজুমদার রয়েছেন, লেখা আছে? ভুলও তো হতে পারে। ভগবান, তাই যেন হয়। অরবিন্দ সমাদ্দার কিংবা অরবিন্দ মুখার্জি নামে কেউ, কিন্তু অরবিন্দ মজুমদার যেন না হয়। ছাপার ভুল কিংবা আদালত সংবাদদাতার লেখার ভুল এইরকম একটা কিছু যেন হয়।

কাগজগুলো বিছানার উপর রেখে সে একটার পর একটা খুঁটিয়ে পড়ল। দুটো কাগজে আইন-আদালত কলামে খবরটা বেরিয়েছে, দুই প্যারাগ্রাফ। বাকিগুলোতে খেলার পাতায় বেরিয়েছে রীতিমত ফলাও করে। ইদানীং চাঞ্চল্যকর খবর বার করায় নাম করেছে 'প্রভাত সংবাদ' পত্রিকা। এদের রিপোর্টার রঞ্জন অধিকারীকে টেন্ট থেকে বার করে দিয়েছিলেন অরবিন্দদা, তার বক্তব্য বিকৃত করে রিপোর্ট করার জন্য। তার ফলে ক্লাবে প্রেসিডেন্ট সন্তোষ ভট্টাচার্যকে কিছু সমর্থক ঘেরাও করে গালাগালি দিয়েছিল। বিশ্রী একটা নোংরা আবহাওয়া ক্লাবে তৈরি করে দিয়েছিল রঞ্জনের রিপোর্ট। সরোজ সেনের সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেছিল প্রেসিডেন্টের। দিন সাতেক পর রঞ্জন টেন্টে এলে, অরবিন্দদা ওর জামার কলার ধরে ক্লাবের গেট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে শুধু বলেছিলেন, "আগে ভদ্রলোক হও তারপর সাংবাদিক হয়ো।"

রঞ্জনের কাগজ প্রতিশোধ নেবার সুযোগটা ছাড়েনি। বড় অক্ষরে তিন কলাম হেডিং করেছে—ফুটবল কোচ অরবিন্দ মজুমদার গণিকা গৃহে ধরা পড়েছেন। তারপর প্রায় দু'কলাম ধরে, সবিস্তার বর্ণনা পুলিশ হানার, অরবিন্দ মজুমদারের ফুটবল কেরিয়ারের, ওর কোচিংয়ে সারথি সংঘের নানান ট্রফি জয়ের, ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর অসুস্থতার এমনকি জ্যোতির্ময় বিশ্বাসকে আবিষ্কার করার কথাও লেখা হয়েছে।

"আশ্চর্য, এত কথা যোগাড় করে এইটুকু সময়ের মধ্যে লিখে ফেলল!" জ্যোতি একদৃষ্টে ছড়ান কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠিক করে ফেলল, দাশুদার সঙ্গে আগে একবার কথা বলে নেবে।

দাশু বা দাশরথি সেনশর্মা, সারথি সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য ছাড়া, ক্লাবে তার আর কিছু পরিচয় নেই। কখনো কোন কমিটিতে থাকেনি, বিয়ে করেনি,

ইনটিরিয়ার ডেকরেটিংয়ের ব্যবসা করে, প্রতিদিন ক্লাবে হাজিরা দেয়, প্রেসিডেন্ট থেকে মালি সবাই তাকে চেনে, ক্লাবের প্রয়োজনে পনের কুড়ি হাজার টাকা বিনা প্রশ্নে ধার দেয়, ফুটবলারদের বিপদে আপদে তাদের বাড়িতে ছুটে যায়, অন্য ক্লাব থেকে কাউকে ফুসলে আনতে সে মাসের পর মাস পিছনে লেগে থাকতে পারে, আই এফ এ, রাইটার্স বিল্ডিংস, ফোর্ট উইলিয়াম আর লালবাজার, প্রত্যেক জায়গাতেই, যাদের দিয়ে কার্যোদ্ধার হয়, তাদের সঙ্গে দাশুর চেনাপরিচয় আছে। সারথির উপকার হবে, এমন কাজ থেকে তাকে দমান অসম্ভব। ওর আনুগত্য ক্লাবের কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নয়, সারথির মঙ্গল বা হিতই প্রধান বিবেচ্য। হাসিখুশি দিলখোলা বছর পঞ্চাশের এই লোকটির বাইরেটা যত নরম, ভিতরটা কিন্তু ততটা নয়। বিশেষত সারথির স্বার্থ যেখানে জড়িত।

ক্লাবে প্রথম বছরেই জ্যোতিকে পছন্দ করে ফেলে দাশু। বড় ভাইয়ের স্নেহে, নানা উপদেশ ও শাসনের মধ্য দিয়ে সে জ্যোতিকে আড়াল করে প্রথম দুটো বছর রেখেছিল। দরকারও ছিল। তিন চারটি ক্লাব জ্যোতিকে পাবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিল। সারথির দামী সম্পত্তিটিকে ধরে রাখার সুখ ছাড়া তার আর কোন স্বার্থ নেই। জ্যোতি বহুবার নানান ধরনের উপকার নিয়েছে। সর্বশেষটি জমি কেনার ব্যাপারে। রাইটার্সে যথাস্থানে কলকাঠি নেড়ে দাশু সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

দাশুদার বাড়িতে আর কারখানায় ফোন আছে। কিন্তু এখানে ধারেকাছে ফোন নেই। এটাই জ্যোতির মুশকিল। যদি সে অনেকের মতই, মেসে না থেকে বাড়ি থেকেই যাতায়াত করত, তাহলে বাড়িতে টেলিফোন এনে দিত। এসব তার কাছে সমস্যা নয়। কিন্তু বাড়িটা তার কাছে বসবাসের স্থান হিসেবে একদমই পছন্দ নয়। একটা মানসিক প্রতিবন্ধকতা সাত বছর আগে তৈরি হয়ে গেছল যেটাকে আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম তিন বছর সে একদিনের জন্যও টিটাগড় মুখো হয়নি। তারপর মাঝেমধ্যে আসতে শুরু করে কয়েক ঘণ্টার বা একবেলার জন্য। গত বছর থেকে তিন চারদিন টানা থাকছে। নয়তো সিজন শেষ হয়ে গেলে, মেস যখন ফাঁকা, ঘরগুলো বন্ধ, তখন সে দাশুদার গড়চার ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকে।

এটা দাশুদার লুকোন আস্তানা। বন্ধু এবং বান্ধবীদের সঙ্গে হুল্লোড়-ফুর্তি করে সন্ধ্যেটা কাটাবার জন্য পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় পিছনদিকে তিনঘরের ফ্ল্যাটটা বছর দশেক আগে সে ভাড়া নেয়। ফুর্তি গভীর রাত পর্যন্তই গড়ায় এবং

www.BanglaBook.org

বান্ধবীদের কেউ কেউ আর বাড়ি ফেরে না। জ্যোতি প্রথমদিকে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকত। কিন্তু দাশুদাকে সে কখনো অপ্রতিভ বা লজ্জিত হতে দেখেনি। "এসব একটু আধটু দরকার। এখন ঠিক বুঝবি না। আর একটু লায়েক হয়ে নে তারপর আমিই ডাকব, আয় জয়েন কর। এখন একমনে খেলাটা তৈরি কর, কেরিয়ার গড়ে নে।"

অরবিন্দদার ব্যাপারটা সম্পর্কে কি করা যায় তাই নিয়ে এখুনি একবার দাশুদার সঙ্গে কথা বলা দরকার। অরবিন্দদাকে প্রেসিডেন্টের দলবল একদমই পছন্দ করে না। ওকে সরাবার জন্য গত সাত বছরে অন্তত দশবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সরোজ সেন সেগুলো কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করেছে জ্যোতি এবং দাশুদাও। তাছাড়া অরবিন্দদা এমন একটা সময়ে সারথিতে আসেন যখন ক্লাব মুখ থুবড়ে পড়েছে। লীগে মাঝামাঝি জায়গায় থাকার জন্য হাঁকপাঁক করছে, দু বছর ভারতের বড় টুর্নামেন্টগুলোয় থার্ড রাউণ্ডের উপর যেতে পারছিল না, ছোট টুর্নামেন্ট একটাও জিততে পারেনি। ক্লাবের ভিতরে দলাদলি মাথা চাড়া দিয়ে খেলোয়াড়দের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ট্রান্সফারের সময় ক্লাবেরই কোন কোন কর্তা "নিজের" খেলোয়াড়দের অন্যান্য ক্লাবের হাতে তুলে দিয়ে ভাঙন ধরিয়ে দেয়। এমন একটা অবস্থা থেকে অরবিন্দদা দু বছরের মধ্যে ক্লাবকে টেনে তুলে লীগে রানার্স করান, পরের বছরই লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ এবং রোভার্স কাপ নিয়ে আসেন। সারথি আবার চাঙা হয়ে দাপিয়ে চলতে শুরু করে। অরবিন্দ মজুমদার একটা কথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, জ্যোতিকে না পেলে তিনি সফল হতেন না। সাহস এবং আস্থা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় নামতে পারতেন না।

এবার থেকে সারথি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল অরবিন্দদার। দলটা তার মুঠোয় এবং সেই মুঠো তিনি কখনো আলগা করতে রাজী নন। কারুর কোন অনুরোধ, যদি না যুক্তিপূর্ণ হত, তিনি রক্ষা করেননি। শৃঙ্খলা ভাঙলে বা নির্দেশ অমান্য করলে কাউকে রেয়াৎ করেননি। অনেক গণ্যমান্য কর্তা তার কাছ থেকে মান হারিয়ে ফিরে এসেছেন। স্বভাবতই, তার বিরুদ্ধে একটা জোরালো গোষ্ঠী ক্লাবের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে যদিও বাইরে হাজার হাজার ক্লাব সমর্থকদের কাছে তিনি পরিত্রাতা গণ্য হয়েছেন। মূলত এই বাইরের সাধারণ সমর্থকদের ভয়েই কেউ এতকাল অরবিন্দদার গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি। তাছাড়া ট্রফি জয়ের সাফল্যগুলো তো ছিলই।

কিন্তু এখন? কাগজের হেডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে জ্যোতি মাথা নাড়ল।

আর বোধহয় বাঁচান যাবে না। ওর রক্ত নেবার জন্য তো অনেকেই তৈরি, এখন তারা ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এবার লীগে ফোর্থ, বরদলুইয়ে সেমি ফাইনাল থেকে আর ডুরাণ্ডে কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই বিদায় নিয়েছে সারথি। অরবিন্দদার আগের ঔজ্জ্বল্য আর নেই, দাপটও স্তিমিত। এবার এই ঘটনাই ওঁকে শেষ করে দেবে।

বুকের মধ্যে শুধুই বাতাস ছাড়া জ্যোতি আর কিছু বোধ করছে না। শূন্যতা। এই লোকটিই তার খেলা গড়ে দিয়েছে, আজ সে যতটুকু হতে পেরেছে তা ওঁরই জন্য। ক্লাব থেকে ওঁকে সরিয়ে দিলে সে নিজেও খুব ভাল অবস্থায় থাকেবে না। সবাই তাকে জানে অরবিন্দ মজুমদারের 'ছেলে'। নতুন কেউ ওঁর জায়গায় কোচ হয়ে আসবে। যেই আসুক, তার সঙ্গে বনিবনা হবে কিনা কে জানে! তবে জ্যোতি বিশ্বাসকে তাড়াবার চিন্তা নিশ্চয়ই কারুর মাথায় আসবে না। এক লাখ টাকা চাইলে, যুগের যাত্রী তাকে সামনের বছরই কাঁধে তুলে নিয়ে যাবে। দু বছর আগে দেড়লাখ পর্যন্ত ওরা উঠেছিল তাকে পাওয়ার জন্য।

"ছোটু, ছোটু।"

লুঙ্গি ছেড়ে ট্রাউজার্স পরতে-পরতে জ্যোতি হাঁক দিল।

"ছোটু বেরিয়ে গেছে, কি দরকার কি?" আশালতা দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

"এই তিরিশটা টাকা নাও, ছোটুকে বাজারে গিয়ে মাছ আনতে বল, আমি একটু কলকাতায় যাচ্ছি, খুব দরকার।"

"ফিরবি কখন, খাবি তো?"

"তুলে রেখে দিও, যখন ফিরব তখন খাব। কালই আমি মেসে চলে যাব।"

সোমবার থেকে রোভার্সের জন্য প্র্যাকটিস শুরু হবার কথা। জ্যোতি কালো চশমটা চোখে লাগিয়ে ঘর থেকে বেরোল। চশমাটা চার বছর আগের, কুয়া-লালামপুরে কিনেছিল, মারডেকা টুর্ণামেন্টে খেলতে গিয়ে। চশমাটা ছাড়া সে মোটরবাইকে চড়ে না।

বুলেটটাকে ঠেলে বাড়ির বাইরে এনে স্টার্ট দেবার আগে হঠাৎ মনে পড়ায় সে মাকে ডেকে বলল, "কাগজগুলো বিছানায় ছড়ান রয়েছে, আমার দরকারে লাগবে, গুছিয়ে তুলে রেখে দিও। আর বিপিন স্যার যদি খোঁজ নেন তো বোলো খুব দরকারে কলকাতায় গেছি, ফিরে এসেই ওঁর বাড়িতে যাব।"

বিপিন গোস্বামী, অঘোরচন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যা সদনের শিক্ষক। জ্যোতিকে কেউ যদি আবিষ্কার করে থাকেন তো তিনি এই বিপিন স্যার। জ্যোতি যখন

www.BanglaBook.org

বাড়ির কাছে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র তখন ওকে একটা ছোট মাঠে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতে দেখে বিপিন স্যার দাঁড়িয়ে পড়েন। জ্যোতিকে ডেকে তার বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে দু'দিন পরই প্রিয়রঞ্জনের কাছে হাজির হন।

ছেলে ভাল ফুটবল খেলে বা তাকে উৎসাহিত করলে বড় খেলোয়াড় হতে পারবে, একথা শুনে প্রিয়রঞ্জন মোটেই উদ্দীপ্ত হননি। বেঁটে, টাকমাথা বিপিন স্যারকে ঘাবড়ে দেবার মত দৃষ্টি হেনে বলেছিলেন, "ফুটবল কি আমার গুষ্টি উদ্ধার করবে? খালি খেলা আর খেলা, লেখাপড়া না করলে এই দিনকালে করেকম্মে খাবে কি? আর আপনি, একটা জ্ঞানীগুণী শিক্ষক হয়ে কিনা বলছেন, ওকে ফুটবল খেলতে দিন!"

"হ্যাঁ বলছি।" ছোট্টখাট্ট মানুষটার গলা থেকে যে এমন কঠিন স্বর বেরোতে পারে, প্রিয়রঞ্জন তা আশা করেননি। থতমত হলেন। কিঞ্চিৎ ঘাবড়ালেনও।

"যার যেটা হবে তাকে সেই পথে যেতে দেওয়াই ভাল। জ্যোতিকে আমাদের স্কুলে নেব। ফ্রিশিপ পাবে, পড়ার বইপত্তর আমিই দেব, আপত্তি আছে আপনার?"

প্রিয়রঞ্জন অসচ্ছল কম্পাউণ্ডার। জুট মিলের ডিস্পেন্সারিতে কাজ করেন। চুরির সুযোগ আছে এবং সে সুযোগ নিতে তিনি দুর্বলতা দেখান না। তবু সংসারের টানাটানি ঘোচে না, যেহেতু চুরির পয়সাগুলো খেয়ে নেয় দিশি মদ। নিজে লেখাপড়া না শিখলেও প্রিয়রঞ্জনের মাথায় এটুকু ধারণা ঢুকে আছে, কলেজের ডিগ্রি চাইই আর সেটা রোজ দু বেলা বই খুলে চিৎকার করে না পড়লে, পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে, দু বেলাই জ্যোতিকে বেদম প্রহার থেকে তিনি বঞ্চিত করেননি। বাবাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করা, ছোটবেলা থেকেই জ্যোতির মধ্যে শুরু হয়ে গেছিল।

অঘোরচন্দ্র স্কুলে পড়াতে খরচ লাগবে না, শুনেই তার বাবা রাজী হয়ে যান। এরপর জ্যোতি ধাপে ধাপে ক্লাস টেন পর্যন্ত ওঠে, কিন্তু ফুটবলে সে আরো দ্রুত ডিঙিয়ে গেছে ধাপগুলো। কলকাতার ময়দানে সে সতেরো বছর বয়সেই পৌঁছে যায়।

মোটর বাইকটা পুকুরের ধার দিয়ে, চার হাত চওড়া ইঁট বাঁধানো রাস্তার দিকে নিয়ে যাবার সময় একতলা বাড়িটার সামনে আসতেই জ্যোতির ভিতরটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কাঠ হয়ে উঠল। তাকাবে না ঠিক করেও একবার চট্ করে আড়চোখে তাকাল।

বাইকের শব্দে একটি কিশোরী কৌতূহল বশতই জানালার কাছে এসে রাস্তায়

তাকিয়েছে। ছ্যাঁৎ করে উঠল জ্যোতির বুক। তারপরই স্বস্তিতে শিথিল হয়ে গেল অ্যাক্সিলেটরের মুঠো। এ বাড়ির লোকজনেরা নতুন। এদের কাউকে সে চেনে না, কখনো চোখেও দেখেনি। বাড়িটা সাত বছর আগে বিক্রি করে বিনয় ভটচায আর তার মেয়ে উষা কোথায় যে চলে গেছে, কেউ তা জানে না। মেয়েটি যে জানলাটি থেকে তাকিয়েছে, ঠিক ওই জানলা থেকেই উষা তাকাত!

ইঁট বাঁধানো রাস্তাটা সর্পিলভাবে আধ মাইল গিয়ে বি টি রোডে মিশেছে। মেশার আগে বাঁদিকে একটা ছোট্ট জমির ধার দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। জনা পনেরো বালক ও কিশোর ফুটবল খেলছে সেই মাঠে।

জগা মালির মাঠ বলা হয় এটাকে। কেন যে এই নাম কেউ তা জানে না। আপনা থেকেই মন্থর হয়ে গেল বাইকটা।

তখন এইরকম দোকানগুলো ছিল না, মাঠের ধারের বাড়িগুলোও নয়। একটি দোতলা বাড়ি আড়াল করে দিয়েছে বিপিন স্যারের কাঠ আর ছিটেবাঁশের দেওয়াল দেওয়া টালির চালের ঘরটাকে। ঘরের জানালা দিয়ে তিনি মাঠে ছেলেদের খেলা দেখতে পেতেন।

জ্যোতি বাইকটা থামাল চায়ের দোকানের সামনে। বেঞ্চে বসে যারা চা খেতে খেতে কথা বলছিল তারা তটস্থ হয়ে গেল। জ্যোতিকে তারা নামে মাত্র চেনে। এই অঞ্চলে সে সবথেকে খ্যাতিমান।

"একটা চা দিন তো ভাই।" বাইকে বসেই সে আন্তরিক স্বরে বলল। চোখ মাঠের দিকে।

"বেঞ্চে এসে বসুন না।" ময়লা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা মাঝবয়সী চা-ওলা বিগলিত স্বরে বলল।

"এই ঠিক আছি, খেলছে কারা?"

"পাড়ারই ছেলেপুলে সব। আপনিও তো জগামালির মাঠে খেলেছেন ছোটবেলায়।"

"হ্যাঁ। তখন মাঠটা একটু বড় ছিল। এইসব বাড়িটাড়ি তখনো হয়নি।"

"আরো ছোট হয়ে যাবে। ধারের দিকের জমি বিক্রি হয়ে গেছে। খেলাটেলা ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাবে।"

জ্যোতি কথা না বলে চায়ের কাপটা নিল। ছোট ছোট চুমুকে দু মিনিটেই চা শেষ করে, পয়সা দিয়ে বাইকে স্টার্ট দিল। আড়চোখে দেখল ছেলেরা খেলা থামিয়ে তাকে দেখছে।

www.BanglaBook.org

॥ দুই ॥

এগার বছর বয়সে অঘোরচন্দ্র স্কুলে আসার পর জ্যোতির্ময় বিশ্বাস শুনতে থাকে, বিশেষ এক ধরনের ফুটবল-প্রতিভা নাকি তার মধ্যে রয়েছে। পরবর্তী কালে অবশ্য ফুটবল সাংবাদিকরা তার সম্পর্কে সঠিক বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে অবশেষে 'দ্বিতীয় চুনী' / 'নতুন বলরাম' ইত্যাদি বাক্যাবলী তার নামের সঙ্গে জুড়েছে।

কি করে ফুটবল খেলতে হয়, সেটা একজনও তাকে শেখায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই, খেলাটা তার কাছে এসেছে। খেলতে খেলতেই সে 'অফ সাইড' 'থ্রো', 'ফ্রি কিক' ইত্যাদি শব্দ শুনেছে আর খেলার নিয়ম জেনেছে। এখন তবু বাঁশের গোলপোস্ট, তার ছোটবেলায় জগামালির মাঠে ইঁট কিংবা শার্ট খুলে গোলের চিহ্ন রাখা হত।

পার্টি করে খেলা হত। দু পক্ষের জন্য ক্যাপ্টেন ঠিক হবার পর ছেলেরা দুজন-দুজন করে দূরে সরে গিয়ে কানে কানে নিজেদের একটা নাম ঠিক করে নিত। তারা দুজন ছাড়া নামদুটো আর কেউ জানবে না।

"ডাক্ ডাক্ ডাক্ কিস্‌কো ডাক্?" কাঁধ ধরাধরি করে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেরা এসে ক্যাপ্টেনদের সামনে দাঁড়িয়ে ওই বলে জিজ্ঞাসা করত। দুই ক্যাপ্টেনের একজন তখন বলত, "হাম কো মেরি তোমকো ডাক।" দুজন ছেলের একজন তখন বলত, "কে নেবে চাপাটি কে নেবে পরোটা, কিংবা হয়তো বলত, "কে নেবে টগর ফুল, কে নেবে পদ্ম ফুল।" কিংবা এই ধরনেরই কিছু।

যে ক্যাপ্টেনের ডাক দেবার কথা সে তীক্ষ্ণ চোখে বোঝার চেষ্টা করত, দুজনের মধ্যে যে ছেলেটি ভাল খেলে তার নাম কোন্‌টা হতে পারে? চাপাটি না পরোটা? দুজনের কেউ অবশ্য ইশারা করে বা ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়েও দিতে পারে সে-ই চাপাটি বা সে-ই পরোটা। অবশ্য এসব ব্যাপার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে তুমুল ঝগড়া এবং হাতাহাতিও শুরু হয়ে যেতে পারে। ক্যাপ্টেন স্রেফ আন্দাজেই বলে দেয়, 'আমি নেব পরোটা।' তখন দুজনের মধ্যে যার নাম পরোটা, সে এগিয়ে এসে ডাকদেওয়া ক্যাপ্টেনের বাঁদিকে দাঁড়াবে। এরপর অন্য ক্যাপ্টেনের ডাক দেবার পালা। আর একজোড়া ছেলে এগিয়ে এসে তাকে বলবে, 'ডাক্ ডাক্ ডাক্ কিসকো ডাক্।'

এইভাবে প্রায় লটারি করেই সাত-আটজনের দুটো দল হত। মুশকিল হত

জ্যোতিকে নিয়ে। দুই ক্যাপ্টেনই তাকে চাইত। অনেক দিন জ্যোতিকে দুই দলের হয়েই আধাআধি করে খেলতে হয়েছে।

লাথি মারা, ঘুঁষি মারা, থুথু দেওয়া, গালাগালি, খিমচে রক্ত বের করা, এগুলো হতই। এজন্য প্রায়ই খেলা বন্ধ হয়ে যেত এবং আবার কিছুক্ষণ পর শুরু হত। বেশির ভাগ ছেলেই ছিল জ্যোতির থেকে পাঁচ-ছয় বছরের বড়। জ্যোতিকে আটকাতে তাদের কাজ ছিল, বল ধরলেই তাকে পিঠে ধাক্কা দিয়ে বা পিছন থেকে গোড়ালিতে লাথি কষিয়ে বা সর্‌রা কেটে ফেলে দিয়ে তাকে বল থেকে সরিয়ে দেওয়া।

প্রথম প্রথম সে ক্ষেপে উঠত। চিৎকার করত, মাঠ থেকে বেরিয়ে যেত কিন্তু এসব করে সে মার খাওয়া থামাতে পারেনি। অবশেষে নিজেকে বাঁচাবার জন্য উপায় খুঁজতে খুঁজতে সে জানতে পারল, হঠাৎ যদি নিজের দৌড়ের গতিটা বাড়িয়ে দেয় বা বল ধরার সময়টা নিখুঁত ভাবে বুঝে নিয়ে এগোয় তাহলে ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারবে। কখন তাকে মারতে আসবে, ওটাও সে ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করে।

জ্যোতির মনে তখন ঘুণাক্ষরেও এই চিন্তাটা আসেনি যে, বড় হয়ে ফুটবল খেলেই সে অর্থ রোজগার করবে, পঁচিশ বছর বয়সের আগেই দেড় লাখ টাকার বাড়ি তৈরির জন্য আর্কিটেক্টের সঙ্গে দেখা করবে।

মাঝে মাঝে যখন সে ছোটবেলার দিকে তাকিয়েছে, জগামালির মাঠের কাছে সে কৃতজ্ঞ থেকেছে। এখানেই সে কষওয়ালা ফুটবলার হবার প্রাথমিক প্রক্রিয়া-গুলোর মধ্যে দিয়ে জীবন শুরু করেছিল। এই মাঠেই সে শিখেছিল কিভাবে মার নিতে হয় এবং তার থেকেও বড় কথা, কিভাবে মার এড়াতে হয়। আজ পর্যন্ত জ্যোতি বড় ধরনের আঘাত পায়নি।

একবার একটা ইংরাজী ম্যাগাজিনে, তার সাফল্যের কারণ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, 'বছরের পর বছর ধরে অসাধারণ ধৈর্যে প্র্যাকটিস আর নিবিড় ট্রেনিংয়ের ফলেই সে এমন নিখুঁত হয়ে উঠেছে।' পড়ে সে খুব হেসেছিল। জ্যোতির মনে হয়েছিল জগামালির মাঠে যা করেছে তার থেকে বেশি কিছু সে এখন করে না। তফাৎটা শুধু, এখন যা করে থাকে সেটা বড় মাঠে, ভিন্ন পরিবেশে আর বেশি লোকের সামনে।

সারথিতে আসার তিন বছরের মধ্যেই খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনগুলো তাকে ফুটবলের সুপারম্যান বানিয়ে এমন একটা জায়গায় তুলে দেয় যে, অপরিণত

www.BanglaBook.org

মস্তিষ্ক, নাবালক, সারথি ভক্তরা তাকে 'সারথির সারথি' বলা শুরু করে দেয়। এই ধরনের স্তুতি সে কখনো গায়ে মাখেনি, স্তাবকতা তার পায়াভারি করেনি। বরং এগুলোকে সে নানান ধরনের সুবিধা আদায়ের সুযোগ রূপেই ব্যবহার করেছে।

একটা ফুটবলারের, বিশেষত স্ট্রাইকারের জীবন, ক'বছর টপ ফর্মে থাকতে পারে? চুনী গোস্বামী থেকে হাবিব পর্যন্ত হিসেব করে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, খুব গুছিয়ে, শৃঙ্খলা মেনে জীবন যাপন এবং খেলার গুরুত্ব বুঝে শক্তি ক্ষয় করে সে সাত বড় জোর আট বছর চুটিয়ে খেলতে পারবে।

দাশুদা তাকে আর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিরাট সাহায্য করেছিল। একদিন তার ফ্ল্যাটে দুজন অচেনা লোক আর দুজন বান্ধবীর সঙ্গে দাশুদা খানা-পিনার সন্ধ্যেটা কাটাবার পর রাত্রে দাশুদা তাকে ঘর থেকে ডাকিয়ে মুখোমুখি বসে।

"জ্যোতি তোকে একটা কথা বলি, এই যে ব্যাঙ্কে চাকরি করছিস, এটা ছেড়ে দে। ক্লাব থেকে অনেক টাকাই তো পাচ্ছিস, বিয়ে-থা করিসনি, বাড়িতেও এমন কিছু খরচের চাহিদা নেই, তোর নিজেরও খরচ বলতে প্রায় কিছুই নেই, কেমন ঠিক বলছি?"

জ্যোতি মাথা হেলাল।

"তোর কাজ মাঠে গোল দেওয়া। সেটা যত বছর ধরে দিবি, তত বছর তোর টাকা। কেমন? তুই যদি বছরগুলো বাড়াতে পারিস তাহলে টাকাও বাড়বে। এই যে হাবিজাবি এধার ওধার ম্যাচ খেলা আর অফিসের খেলা, এগুলো ফুটবলারের শক্তি শুষে নিয়ে শরীরের জোর যেমন কমায় তার থেকেও বেশি ক্ষতি করে মনের দিক থেকে বোদা করে দিয়ে। ফুটবলে অরুচি ধরায়, মাঠে নামতে বিতৃষ্ণা আসে, অনেকেই আমাকে বলেছে সামনে খোলা গোল পেয়েও শট নিতে গাছাড়া ভাবের জন্য বাইরে মেরেছে। এইভাবেই ভেতর থেকে ফুটবল সম্পর্কে আগ্রহ চলে যায় ফলে বছরগুলোও কমে আসে। নিজেকে তাজা রাখার চেষ্টা কর, অফিস ছেড়ে দে।"

"মাসে মাসে এতগুলো টাকা যখন পাচ্ছিই..." জ্যোতি কথাটা শেষ করার আগেই দাশুদা হাতের গ্লাসটা টেবিলে ঠুকে আওয়াজ করল চুপ করার জন্য আদেশ জানাবার ঢঙে।

"এতগুলো টাকা! কত টাকা! তোর খেলা, সুনাম, যশ, খ্যাতি এসবের থেকেও কি বেশি? কয়েক সেকেণ্ড জ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দাশুদা

মেঝে থেকে হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে গ্লাসে অল্প ঢালল। আর একটা বোতল থেকে জল ঢেলে গ্লাসটা ভর্তি করে নিল।

"আজ সওয়া লাখ টাকার অর্ডার পাকা করে নিলুম। যে দুটো লোক এসেছিল দেখেছিস তো ··ওদের ব্যাণ্ডেল অফিসের চেয়ার টেবল থেকে পর্দা পর্যন্ত সব আমার কোম্পানি করে দেবে। এজন্য আমাকে কি করতে হল? দুটো মেয়েমানুষ, ওদের তো এখানে অনেকবার দেখেছিস, দেড় বোতল ভ্যাট সিক্সটিনাইন আর ব্লু ফিল্ম। ঘরে প্রোজেক্টার আছে এটা বোধহয় তুই এখনো জানিস না।"

জ্যোতি জানত না তাই অবাকই হল। ব্লু ফিল্মে কি থাকে সেটা অনেকের কাছে শুনেছে কিন্তু কখনো দেখেনি। দেখার জন্য কৌতূহল যথেষ্ট আছে।

"তোকে দেখাব। তোকে একটা পুরুষমানুষ তৈরি করে দোব। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম, সওয়া লাখ টাকার অর্ডার···লোক দুটো খুব শিক্ষিত, একজন আবার ম্যাগাজিনে পদ্যও লেখে, দুজনেই সোনাগাছি যায় বলে খবর পেয়েছি, ব্যাস, এটুকু জানাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, তুই কি যেন বললি তখন···টাকা, মাসে মাসে অতগুলো, কতগুলো? এই অর্ডারের জন্য যে টাকা খরচ করলুম, এটা করতে হতো না যদি তুই একবার গিয়ে দাঁড়াতিস।"

"মানে!"

"মানে আবার কি, তুই কি জানিস কতটা তোর পপুলারিটি, তোর ফ্যান, তোর ভক্ত কত আছে? যে কোন অফিসে তুই গিয়ে দাঁড়ালে কত লোক তোকে শুধু দেখতে আসবে, সই নেবে, তা কি তুই জানিস?"

জ্যোতি একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইল দাশুদার মুখের দিকে। খুব আন্তরিক ভাবে বলছে। এত ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে আগে তার কাছে কখনো মন খোলেনি।

"তুই গিয়ে যদি একটু হেসে বলিস, এই কাজটা আমার জন্য একটু যদি করে দেন, তাহলে উপকার হয়, তাহলে মিনিস্টার থেকে বেয়ারা—কোন্ ব্যাটা না করে দেবে? করবি?"

"কি করব?"

"আমার হয়ে একটু বলা-কওয়া, এখান-ওখানে যাওয়া, বাড়িতে গিয়ে বৌদের কি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব, রিকোয়েস্ট করলে ফাংশানে প্রধান অতিথি-টতিথি হওয়া, মোট কথা, ওদের ধন্য করে দিবি, আর তুইও কৃতার্থ হচ্ছিস এমনভাবে করবি···করবি?"

"তোমার অর্ডার সিকিওর করার জন্য?"

www.BanglaBook.org

"টেন পার্সেন্ট দোব, চাকরি করার থেকে অনেক ভাল। তাছাড়া ইচ্ছে আছে, তোর টাকাগুলো যাতে কাজে লাগিয়ে বাড়াতে পারিস তেমন একটা ব্যবস্থা করার। শৈবাল রেস্টুরেন্ট করেছে শ্যামবাজারে, অজিত স্টিলের বাসনকোসনের দোকান দিয়েছে গড়িয়াহাটে, বাচ্চু মিত্তির কাপড়ের এজেন্সি নিয়েছে এক গুজরাটির সঙ্গে শেয়ারে, শোরুম খুলেছে বেলেঘাটায়। ভাবছি প্লাইউডের বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের কাজে নামব। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনছিলাম, দুর্গাপুরে তাদের নতুন দুটো অফিস বাড়ি হচ্ছে আর স্টাফ কোয়ার্টার। শুধু দরজার জন্যই ওরা আট লাখ টাকার অর্ডার দিয়েছে। শুনে মনে হয়েছিল, আমিও তো অনেকটা এই ধরনের জিনিসই করি। কারখানাটা বাড়িয়ে আলাদা একটা বিজনেস শুরু করা যায়। যদি চাস তো তোকে পার্টনার করব। এখনই নামছি না, আগে বাজার বুঝেনি, হুট করে এসব ব্যবসায়ে তো আর নামা যায় না। তোকে শুধু আমার মনের ইচ্ছেটা জানিয়ে রাখলাম। পরে ভেবে দেখিস।"

জ্যোতি বলতে যাচ্ছিল, ব্যবসার সে কিছুই বোঝে না, যদি টাকা মার যায় তাহলে তো পথে বসতে হবে। দাশুদা তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই মনের ভিতরটা পড়ে নিয়ে বলল, "লোকসান যাবে তোর, এমন কাজ আমার দ্বারা হবে না জেনে রাখিস।"

তারপর হঠাৎই ছলছল করে ওঠে দাশুদার চোখ। গলা নামিয়ে কোমল স্বরে বলে, "জ্যোতি, তোকে আমি ভালবাসি। তোর খেলা আমাকে নেশা ধরিয়ে দেয়, বুঁদ হয়ে যাই, কেমন যেন উদাস লাগে। মদ, মেয়েমানুষ, টাকা, সব কিছু তুচ্ছ মনে হয়। বিয়ে করিনি, কিন্তু তুই যদি আমার ছেলে হতিস! ছেলের জন্য যা যা করতাম সেইসব করতে ইচ্ছে করে তোর জন্য।"

"একটু আগে তুমি ব্লু ফিল্ম দেখাবে বলেছ।"

গ্লাসটা মুখের কাছে তুলেছিল, ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে দাশুদা আচমকা অট্টহাসে উছলে উঠল।

"ব্যাটা ধরেছিস তো বেশ। ছেলেকে ব্লু ফিল্ম দেখাবে কিনা বাবা? হা হা হা, না রে জ্যোতি, তুই আমার ছেলে হোসনি। আমার দ্বারা বাপ হওয়া সম্ভব নয়।"

আবার অট্টহাসি। কিছুক্ষণ পর চোখের জল মুছে নিজেকে সামলে তুলে দাশুদা গম্ভীর গলায়, কেজো গলায়, বলল, "আসলে ব্যাপারটা কি জানিস, ফুটবল বা এইরকম সব খেলায় যাতে গতর খাটাতে হয়, রীতিমত ঘাম রক্ত ঝরাতে হয়,

টেনশনে থাকতে হয়, এতে শরীরটা ছিলেটানা ধনুকের মত হয়ে যায়। বেশিক্ষণ এই ভাবে টেনে রাখলে ধনুকটা মটাৎ করে ভেঙে যেতে পারে। তাই ছিলেটা আলগা করে দিতে হয়। যে কোন স্পোর্টসম্যানের শরীরও এই ধনুকের মত।"

থেমে গিয়ে দাশুদা মিটমিট চোখে জ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অস্বস্তি বোধ করল সে। কি বলতে চায় দাশুদা বুঝতে পারছে না।

"মাথায় ঢুকল না? কলকাতার ফুটবলাররা বড় মাথামোটা হয়, তোর শরীর গরম লাগে না? ভেতরে টান ধরে না ধনুকের ছিলের মত?"

জ্যোতি নড়ে বসল। দাশুদার কথার ইঙ্গিতটা সে বুঝতে পারছে।

"আলগা করা দরকার, নয়তো মটাৎ হয়ে যাবে। এটা খারাপ কিছু নয়। আমি নিজে খেলি না কিন্তু বুঝতে পারি। কত বড় বড় ফুটবলারকে তো দেখেছি, টান আর সহ্য করতে পারে না, মেয়েমানুষের কাছে ছুটে যেতেই হয়। ভগবানের এই আশ্চর্য এক যন্তর হল মেয়েমানুষ। সবার দরকার হয়। কি খুনী, কি পুলিশ, কি ঘুষ দেনেওলা, কি ঘুষ লেনেওলা, কি ফুটবলার, কি রেফারী, যারাই টেনশনের মধ্য দিয়ে চলে তাদের আলগা হওয়ার কাজটা মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুতে হয় না। জ্যোতি, যদি তুই তাড়াতাড়ি খাক্ হয়ে জ্বলে যেতে না চাস তাহলে মেয়েমানুষ ধর। লোকে বলবে তোকে নষ্ট হবার বুদ্ধি দিচ্ছি, কিন্তু আমি বলি তুই মাঝে মাঝে ফুর্তি কর। ডিসিপ্লিন্‌ড থাকবি, বাড়াবাড়ি করবি না, শুধু ঠাণ্ডা করার জন্য নিজেকে ভিজিয়ে নিবি। তোর ভাবসাব আছে কি কোন মেয়ের সঙ্গে?"

সন্ত্রস্তের মতো কুঁকড়ে গিয়ে জ্যোতি ব্যগ্র স্বরে বলল, "না না, কারুর সঙ্গে ভাব নেই।"

"গৌরীকে দেখেছিস? আজকেই তো ছিল এখানে, লম্বা ছিপছিপে ফর্সাটারে। পছন্দ হয়?"

"কি যে আবোলতাবোল বকছ তখন থেকে।" জ্যোতি উঠে দাঁড়াল। "ঘুম পাচ্ছে আমার।"

"বোস্। বোস্ বলছি।"

ধমকে উঠল দাশুদা। গ্লাসটায় শেষ চুমুক দিয়ে ঝুঁকে বোতলটা তুলল। চোখের সামনে ধরে কতটা রয়েছে দেখে নিয়ে বলল, "এটা শেষ করে আমিও ঘুমোব। ততক্ষণ বোস।"

ছোকরা চাকর-তথা-ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার নাণ্টু এসে টেবল থেকে খালি বোতলটা তুলে নিল।

www.BanglaBook.org

"দুটো কাটলেট আছে, গরম করে দেব?"

"নাহ্, বরং জ্যোতিকে দে।"

"এত রাতে কাটলেট, পাগল হয়েছ!"

"নাণ্টু, তাহলে তুইই খেয়ে নে।"

নাণ্টু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর দাশুদা একটু আনমনা হল। একদৃষ্টে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কি একটা ভাবতে-ভাবতে বলল, "নাণ্টুকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি যখন ওর বারো বছর বয়স। ফুটপাথেই জন্মেছে, বাপ জিনিসটা যে কি তা জানে না। ওর পাঁচটা ভাইবোন, কে কোথায় ছিটকেছাটকে গেছে জানে না। খুব ফেইথফুল। ও জানে এখানে কি কাজকম্মো হয়, কিন্তু ওর পেট থেকে একটা কথাও কেউ বার করতে পারবে না।"

দাশুদা হাসল। স্বচ্ছ নির্মল হাসি।

"নাণ্টুর মত বারো বছর বয়েসে আমার বাবা মারা যায়। দাদা তখন কলেজে পড়ে। খুব কষ্টে আমরা বড় হয়েছি। তুই কি কখনো কষ্ট পেয়েছিস?"

জ্যোতি ইতঃস্তত করল। অভাবের সংসারে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে। তবু একটা পর্যায় রেখে তাদের সংসারটা বাবার চাকরির টাকায় চলেছে। গায়ে জামা, পায়ে চটি বা থালায় ভাত বরাবরই পেয়েছে। কিন্তু সবই ছিল দারিদ্র্যের কিনার ঘেঁষে।

"পেয়েছি, কিন্তু বলার মত নয়।"

দাশুদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর হাতের গ্লাসটা ঝাঁকিয়ে যেন নিজের অতীতকে খারিজ করে দিয়ে বলল, "গৌরী মেয়েটা আমার অনেক কাজ উদ্ধার করে দিয়েছে। ওকে মাসে মাসে টাকা দিই, আটশো করে, কাজ না থাকলেও। কাজ করে দিলে আলাদা দু'হাজারও দিয়েছি। দু' তিনটে ক্লায়েন্টও জুটিয়ে দিয়েছি। এই ধরনের কাজই। চেহারায়, কথায়, চালচলনে সফিস্টিকেটেড। প্রত্যেকেই হ্যাপি ওর সম্পর্কে। মাস চারেক আগে এক সুগার ফ্যাক্টরির গুজরাটি মালিকের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের কতকগুলো জায়গা ঘুরে এল। ভাল টাকাই পেয়েছে। ভাল ঘরেই ওর বিয়ে হয়েছিল। স্বামীটা কোকেনের নেশা করত।...যা এবার ঘুমো গে।"

"তুমি একে পেলে কি করে?"

"পেতে কি হয়, নিজেরাই আসে। যেমন, তুই একদিন নিজেই এসেছিলি অরবিন্দ মজুমদারের কাছে, মনে আছে?"

॥ তিন ॥

জ্যোতির অবশ্যই মনে আছে সেকথা। সারা জীবন সে মনে করে রাখবে। কেন সে মার খাওয়া ভীত কুকুরের মতো শুধুমাত্র লুকিয়ে থাকার একটা জায়গা পাবার আশায় সল্ট লেকে অরবিন্দ মজুমদারের ফ্ল্যাটের কলিংবেল টিপেছিল এবং তারপর জীবনের মোড় দ্রুত ঘুরে গিয়ে কিভাবে একটা সফল জীবনের দিকে তাকে ঠেলে দিয়েছিল, সে কথা কোনদিন সে কাউকে বলেনি কারণ সেগুলো বলার মতো কথা নয়।

শ্যামবাজার মোড় থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ধরে জ্যোতির বুলেট দক্ষিণে এগিয়ে অরবিন্দ সরণিতে বাঁক নিল। পূব দিকে মিনিট তিন-চার গিয়েই উল্টাডাঙ্গা রেলস্টেশন। আরো এগিয়ে তিনটি রাস্তার মোড়। সেখান থেকে বুলেট সল্ট লেক শহরের রাস্তা নিল।

দু'ঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে সরকারী আবাসন। দোতলায় অরবিন্দ মজুমদারের ফ্ল্যাট। জ্যোতি প্রথম যখন আসে তখন সবেমাত্র আবাসনটি তৈরি হয়েছে। চারদিকে ধূ-ধূ মাঠ। প্রাইভেট বাসের টার্মিনাস দশ মিনিট হেঁটে এবং কমপক্ষে আধঘণ্টা অপেক্ষা করে বাস পাওয়া যেত। ফ্ল্যাট কিনেও বহু মালিকই থাকত না। দোকান-বাজার এত দূরে, তাছাড়া নির্জনতা এবং মশার জন্যও থাকা সম্ভব নয়। অনেকেই ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে দেয়। তখন অরবিন্দ মজুমদার ভাড়া নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সারথি-সংঘের কোচের জন্য দাশুদাই ফ্ল্যাটটি সংগ্রহ করে দেয়।

কিন্তু তিন-চার বছরের মধ্যেই শ'য়ে শ'য়ে বাড়ি তৈরি শুরু হয়ে যায়। অধিকাংশ দোতলা এবং অনেকগুলিরই বাইরের চেহারা আধুনিক গৃহস্থাপত্যের নিদর্শনরূপে তাকিয়ে থাকার মতো। সরকারী অফিসের সংখ্যা বেড়েছে, লোকজনের বাস বেড়েছে, পরিবহণ বেড়েছে। জ্যোতির প্রথম দেখা সল্ট লেক বা বিধাননগর এখন আর নেই।

কলিংবেলের আওয়াজটা আর আগের মতো নেই। তিনটি মিষ্টি শব্দের বদলে এখন সুরেলা ধ্বনি। প্রভাতীবৌদি এই সময় বারান্দায় হেলান চেয়ারে বসে থাকেন। বিধবা এক প্রৌঢ়া তাকে রাতদিন দেখাশোনা এবং রান্নার কাজ করে। ঠিকে ঝি বাকি কাজ করে চলে যায়।

একতলায় সিঁড়ির পাশে সরু জায়গায় স্কুটারটা দেখে জ্যোতি আশ্বস্ত হয়েছিল।

www.BanglaBook.org

তাহলে আছে। কিন্তু বেল টেপার পরই সে কাঠ হয়ে রইল। ভিতর থেকে কেউ যেন "কে" বলল। হঠাৎই তার মনে হল, চলে যাই। এখন আসাটা বোকামি হয়েছে। দাশুদার কাছে প্রথমে যাবে ঠিক করেছিল। নানান কথা ভাবতে ভাবতে শ্যামবাজার থেকে অন্যমনস্কের মতো বাইক চালিয়ে সল্ট লেকে ঢোকার আগেও তার মনে ছিল না, ঠিক কি জন্য সে অরবিন্দদার কাছে যাচ্ছে।

মনে যখন পড়ল, কলিংবেল সুইচ ততক্ষণে টেপা হয়ে গেছে। দরজাটা সামান্য ফাঁক হল। একটি চোখ আর সাদা থান কাপড়। চেনা লোক দেখে পাল্লাটা আরো ফাঁক হল।

"অরবিন্দদা…"

"দাদা আর বৌদি তো ভোরবেলাতেই চলে গেছে।"

"চলে গেছে? কোথায়?"

"দেশের বাড়িতে।"

অরবিন্দদার দেশ তারকেশ্বরের দিকে রাজপুর নামে এক গ্রামে, কিন্তু ভোরবেলায় পক্ষাঘাতে পঙ্গু বৌদিকে নিয়ে গেল কি করে?

"সঙ্গে আর কেউ ছিল?"

"এক বাবু এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে।"

"কি রকম দেখতে?"

"রোগা, লম্বা, খুব ফর্সা, চোখে সোনার চশমা…"

"ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, সামনে চুল ওঠা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"খয়েরি রঙের মোটর?"

"হ্যাঁ।"

"কিছু বলে গেছে, কখন আসবে?"

"কিছু তো বলেনি। দাদা শুধু বলল, দেশে হঠাৎই খুব জরুরী কাজ পড়ে গেছে, বৌদিকে নিয়ে যেতেই হবে। পরে একসময় এসে কাপড় চোপড় নিয়ে যাবে আর আমাকেও যেতে হবে।"

দরজার ফাঁক দিয়ে জ্যোতি ভিতরে তাকিয়ে দালানে খাবার টেবলের উপর একটা খবরের কাগজ দেখতে পেল। এখনো খোলা হয়নি।

"কাগজটা কখন এল?"

"এই তো একটু আগে দাদারা চলে যাবার পর। বড্ড বেলায় এখানে কাগজ দেয়।"

"যে লোকটা এসেছিল সে কি কাগজ হাতে এসেছিল ?"

"হ্যাঁ। দাদা তার কাছ থেকেই কাগজ নিয়ে পড়ল !"

"তারপর বলল দেশে চলে যাবে ?"

"হ্যাঁ।"

"বৌদি কি বলল ?"

"কি আর বলবে, যে মানুষ শুয়েই থাকে সারাদিন তার আবার বলাবলি কি ? আমাকে-বৌদি শুধু বলল, দাদার খুব বিপদ হবে কলকাতায় থাকলে, খারাপ লোকেরা দাদার পেছনে লেগেছে, প্রাণে মারারও চেষ্টা করছে তাই কেউ জানার আগেই চলে যাচ্ছে।"

"কবে আসবে কিছু তো বলেনি, তোমাকে বাজার-টাজার করার টাকা দিয়ে গেছে ?"

"একশো টাকা দিয়েছে।"

জ্যোতি নীচে নেমে এল। সেই সময় একতলার ফ্ল্যাট থেকে এক মহিলা বাচ্চার হাত ধরে বেরোলেন। স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন মনে হল। চাহনি থেকে জ্যোতির আরো মনে হল, খবরটা ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছেন। ইনি একবার তার সই নিয়েছিলেন ভাইয়ের জন্য। দেখা হলে বিগলিত হাসি হাসেন।

"ওরা তো ভোরবেলায়ই চলে গেছেন।"

গম্ভীর মুখে জ্যোতি শুধু মাথা নাড়ল।

"ভালোই করেছেন," গলাটা আরো নামিয়ে, "এরপর এখানে না থাকাই উচিত।"

জ্যোতি তার বুলেটকে দু হাতে ধরে স্টার্ট দিতে যাচ্ছে, মহিলা তখন পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওর স্ত্রী কী ভীষণ মানসিক আঘাত পেলেন বলুন তো ? এই শক কাটিয়ে ওঠা—"

জ্যোতি এঞ্জিনটাকে তখন এত জোরে তিন-চারবার রেস করাল যে সেই গর্জনে মহিলার স্বর ডুবে গেল। বুলেট ছিটকে বেরিয়ে গেল মহিলাটির গা ঘেঁষে। জ্যোতি একবারও আর পিছনে তাকায়নি।

তাহলে দাশুদা সকালে এসেছিল। এখন রাজপুরে তার যাওয়ার কোন মানে হয় না। জ্যোতি ধরেই নিল, দাশুদা ওদের সঙ্গে যাবে না। যাতায়াতে প্রায় আশি-নব্বুই মাইল। কাজের লোক, সময় অপচয় করতে চাইবে না। তাছাড়া সঙ্গে থেকেই বা কি করবে! গাড়িটা দিয়েছে ওদের পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য।

www.BanglaBook.org

সারথির কোচকে অসম্ভ্রমের হাত থেকে বাঁচাতে, কিংবা সারথিরই মান বাঁচাতে দাশুদা ছুটে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এরপর ? অরবিন্দদা কি আর মাঠে আসবেন ?

জ্যোতি প্রথমে ভাবল বাড়ি ফিরে যাবে। উল্টাডাঙ্গার মোড়ে পৌঁছে সে মন বদলাল। এখন একবার দাশুদার ফ্ল্যাটে গিয়ে বরং দেখা যাক। হয়তো রাজপুরে নিয়ে গেছেন রটিয়ে দিয়ে আসলে ওখানেই নিয়ে গিয়ে ওদের তুলেছে। দাশুদার সরল হাবভাবের আড়ালে চমৎকার একটি কুটিল মন যে লুকিয়ে রাখে, এটা সে এতদিনে জেনে গেছে।

বাড়ির নীচে, সিমেন্ট বাঁধানো গাড়ি রাখার চত্বর। জ্যোতি তার বুলেট সেখানে রেখে, দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানল দাশুদাকে সে কাল রাতে গাড়িতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। ফিরলে গাড়িটা তো এখানেই থাকত।

ফ্ল্যাটের কলিংবেল সুইচে আঙুল দিতে গিয়ে তার চোখে পড়ল, দরজাটা অল্প ফাঁক হয়ে রয়েছে। কেউ ঢুকেছে অথবা বেরিয়েছে। বেরোলে নাণ্টু ই।

পা টিপে সে ভিতরে ঢুকল। বসার ও খাওয়ার জন্য লম্বা দালানটা ফাঁকা, তার দুদিকে তিনটি ঘর। জ্যোতি এসে যে ঘরটায় থাকে সেটার দরজা আধ ভেজান। বাকি দুটি দাশুদার খাস ঘর। বন্ধ রয়েছে। রাতে বেরিয়ে দাশুদা আর তাহলে ফেরেনি।

সন্তর্পণে দরজার পাল্লাটা ঠেলে ঘরের ভিতরে তাকিয়েই জ্যোতি চমকে উঠল। তার পক্ষে এটা কল্পনাতেও অসম্ভব। খাটে উপুড় হয়ে একটা বালিশ বুকে জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে এবং চুল, পিঠ, নিতম্ব নির্ভুলভাবে গৌরীকে চিনিয়ে দিচ্ছে। এই দেহটিকে সে চেনে।

এই সকালে! তার ঘরে! ব্যাপার কি!

জ্যোতি নিথর দাঁড়িয়ে রইল মিনিট দুয়েক, চাহনির মারফৎ তার বিস্ময় এবং হঠাৎ জেগে ওঠা কামনা বুলিয়ে দিল গৌরীকে মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। তারপর নিঃসাড়ে এগিয়ে খাটে বসে ঝুঁকে মুখটা নিয়ে গেল ঘাড়ের কাছে। চুলের কিনার ঘাড়েই শেষ হয়েছে, সেখান থেকে নীচু-গলা ব্লাউজের ফাঁকের মাঝে মসৃণ সাটিনের মত গাত্রত্বক। জ্যোতি জিভ দিয়ে চাটল।

"কে, কে !"

গৌরী ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চোখ থেকে ঘুমের রেশ কাটিয়ে ওঠার জন্য বার কয়েক পিটপিট করে ক্ষীণ হাসল।

বুকের কাপড় খসে পড়েছে। জ্যোতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে সে কাপড়টা

কাঁধে তুলে দিল, জ্যোতি কাঁধ থেকে সেটা ফেলে দিয়ে বলল, "এখন তাহলে ব্রা পরতে হচ্ছে।"

গৌরী আবার শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করে ঘুমজড়ানো স্বরে বলল, "বয়স তো হচ্ছে।"

"কত হল?"

"তোমার বয়সের সঙ্গে চার-পাঁচ যোগ কর।"

"আমার বয়স কত জানো?"

"কত জায়গায় তোমার জীবনী বেরিয়েছে।"

"তুমি সে সব পড়েছ? ফুটবলে তোমার ইন্টারেস্ট আছে বলে তো জানা ছিল না।"

"আজও নেই। খেলা-টেলার কোনও খবরই রাখি না।"

"তাহলে পড়লে কেন?"

"দাশুদা একবার একটা ম্যাগাজিন পড়তে দিয়েছিল।"

"কবে, কতদিন আগে?"

"অনেক দিন আগে, তখনো আলাপসালাপ হয়নি। দাশুদা বলল, এই খোকাটাকে পুরুষমানুষ বানিয়ে দে তো।"

"বানাতে পেরেছ?"

চোখ বোজা গৌরীর ঠোঁটদুটোয় স্মিত হাসি ছাড়িয়ে পড়ল।

"মনে তো হচ্ছে পারিনি।"

জ্যোতি মুখটা নামিয়ে গৌরীর দুই স্তনের মাঝে চেপে ধরল। আলতো করে ডান হাতটা গৌরী ওর মাথায় রাখল। চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চিরুনির মতো চালাতে চালাতে বলল, "বড্ড টায়ার্ড লাগছে।"

"রাতে কোথাও ছিলে?"

"হ্যাঁ, গ্র্যাণ্ডে। দিল্লী থেকে একজন বড় অফিসার এসেছে। তার সুইটেই ওরা পার্টি দিয়েছিল।"

"তাহলে ঘুমোও এখন।"

জ্যোতি মুখ তুলতে যাচ্ছিল। গৌরী চেপে ধরে রইল।

"থাকো। ভাল লাগছে।"

জ্যোতি আর একটু সরে এসে মুখটা পাশ ফিরিয়ে দু হাতে গৌরীকে জড়িয়ে ধরল। গৌরী ওর চুলে বিলি কেটে যেতে লাগল।

www.BanglaBook.org

"কাল ভেলোর যাব।"

"ভেলোর! কেন? ওখানে তো লোকে অপারেশন করাতে যায়।"

"তোতনের হার্টের অবস্থা বিপজ্জনক।"

"তার মানে?"

জ্যোতি মুখ তুলল। গৌরী সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে। চোখে ভেসে রয়েছে চাপা যন্ত্রণা।

"জন্ম থেকেই ওর হার্টে ত্রুটি রয়েছে। একটা ভাল্‌ভ কাজ করে না। আমায় প্রায়ই বলত, খেলতে গেলে হাঁপিয়ে পড়ে। তখন গ্রাহ্য করতাম না। এবার ও যখন এসেছিল স্পেশ্যালিস্ট দেখাই আর তখনই জানা গেল, ডাক্তার মোদকই বললেন ভেলোরে গিয়ে ঠিক করিয়ে নিতে। তিনিই চিঠিপত্র লিখে যা করার করেছেন। আমি কাল তোতনকে নিয়ে যাব।"

"এত ব্যাপার হয়ে গেছে, কই কিছু তো বলনি?"

গৌরী হাসল, জ্যোতি উঠে বসল।

"আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এসব। সবাইকে বলে বেড়াব কেন?"

জ্যোতি কখনো কৌতূহল দেখায়নি গৌরীর নিজস্ব ব্যাপারে। দাশুদাই বারণ করে দিয়েছিল, 'প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব কিছু গোপনীয়তা থাকে। সেগুলো লোকে জানুক এটা সবাই চায় না। গৌরী খুব চাপা মেয়ে।'

দাশুদার কাছ থেকে সে শুধু জেনেছিল, গৌরী তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে যায়, তারপর ডিভোর্স করে। ছেলেকে কালিংপঙে একটা স্কুলে পড়াচ্ছে। এখন বয়েস বছর দশেক। তোতনকে জ্যোতি কখনো দেখেনি। একবার গৌরী তার অটোগ্রাফ করা ছবি চেয়ে নিয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছিল। 'তোতনকে লিখেছিলাম, জ্যোতি বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ও তো বিশ্বাসই করতে চায় না। লিখেছে, ওর সই করা ছবি পাঠাও। ও যে তোমার ফ্যান আমি জানতামই না। একটা ছবি সই করে দিও তো।'

জ্যোতি দিয়েছিল এবং ব্যাপারটা ভুলে গেছল।

"কি রকম খরচ পড়বে?"

"তা ভালই পড়বে। যা জমাতে পেরেছি সবই যাবে। আরও হাজার দশেক যোগাড় করতে হবে।"

"তোমার সঙ্গে অনেক টাকাওলা লোকের চেনা আছে।"

"তা আছে। কিন্তু দশ হাজার কেউ দেবে না।"

"দাশুদা ?"

"সে জন্যই তো এসেছি। নান্টুর কাছে শুনলাম কাল রাতে এসেই আবার চলে গেছে।"

জ্যোতির মনে পড়ে গেল তার নিজের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা।

"তুমি আজকের কাগজ পড়েছ ?"

"নাহ্, পড়ার সময় পেলাম কই। কেন কি হয়েছে ?"

জ্যোতি কাগজের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল নান্টু সোফায় বসে একটা বাংলা কমিকস মন দিয়ে দেখছে। তাকে দেখে সে মুখ তুলে তাকাল।

"কোথায় ছিলিস এতক্ষণ ? দরজা খুলে রেখে বেরিয়েছিলি !"

"ওপরের ফ্ল্যাটে গেছলুম, বইটা আনতে।"

"রান্না করেছিস ?"

"গৌরীদি বলল খাবে না শরীর খারাপ। শুধু আমার জন্য রেঁধেছি।"

"আজকের কাগজটা কোথায় ?" এই বলে জ্যোতি নিজেই টেবলের নীচের র‍্যাক থেকে দু-তিনটি কাগজের মধ্যে প্রভাত সংবাদটা তুলে নিল। "আমার জন্য আড়াইশো দই নিয়ে আয়, ভাত দিয়ে খাব।"

পাঁচ টাকার নোট নান্টুকে দিয়ে সে ঘরে এল। গৌরী মুখ ফিরিয়ে শুয়ে।

"এই খবরটা আগে পড়।"

গৌরীর মুখের দিকে জ্যোতি তাকিয়ে রইল। যতক্ষণ ধরে সে খবরটা পড়ল। বিশেষ কোন ভাবান্তর হতে দেখল না। তার মনে হল, সারথি বা তার ফুটবল কোচ সম্পর্কে কোন পরিচয় বা আগ্রহ না থাকায় গৌরীর কাছে এই ধরনের খবরের কোন তাৎপর্য নেই।

"অরবিন্দ মজুমদারের বাড়ি থেকে এখানে আসছি। ওখানে শুনলাম অরবিন্দদা আর তার পঙ্গু বৌকে কেউ একজন ভোরে এসে গাড়িতে করে নিয়ে গেছেন দেশের বাড়িতে। ওই একজনটি দাশুদা।"

"কেন ?"

"বৌদি এখনো বোধহয় জানে না। জানার আগেই সরিয়ে নিয়ে গেল।"

"তোমার অরবিন্দদাকেও এবার ক্লাব থেকে সরিয়ে ফেলা সহজ হয়ে যাবে।"

"এরকম বললে কেন ?" জ্যোতি চমকে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"এমনিই মনে হল তাই বললাম। তুমি এসব জায়গায় যাওটাও না তো ?"

"কোনদিনই না।"

www.BanglaBook.org

"সাবধান। তাহলে কিন্তু হঠাৎ পুলিশ রেড করে ধরে নিয়ে গেলে কাগজে এইরকম বড় বড় করে হেডিং বেরোবে, আর কেরিয়ার খতম হয়ে যাবে।"

"কিন্তু তুমি একথা বললে কেন, অরবিন্দদাকে এবার ক্লাব থেকে সরিয়ে ফেলা সহজ হয়ে যাবে ? এ সম্পর্কে জান কিছু ?"

"একবার, মাস চারেক আগে, দাশুদা গল্প করতে করতে ওর এক ক্লায়েন্টকে বলেছিল, আমি তো ক্লাবটলাব অত বুঝি না তাই কানও দিইনি, তবে কথাটা কানে গেছল, 'অরবিন্দ মজুমদার ফিনিশ হয়ে গেছে, সারথি আর কিছু ওর কাছ থেকে পাবে না, একটা ট্রফিও এবছর আনতে পারল না' তারপর হঠাৎ এই খবরটা পড়ে কি রকম যেন মনে হল তাই বলে ফেললাম।"

"অদ্ভুত তো !"

"কিসের অদ্ভুত ? আমার এমন মনে হওয়াটা ?"

গৌরী নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জানলার দিকে। জ্যোতি তাকিয়ে আছে গৌরীর মুখে। বয়স হঠাৎ যেন আঁচড়িয়ে দিল মুখটায়। হালকা সুর্মার নীচে কালি পড়েছে, গালের মাংস ঝুলে গেছে, ভাঁজ পড়েছে ঠোঁটের দুধারে।

"মাঠের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছি, যা তুমি হয়তো যাওনি।"

"তুমি কতটা জান আমার সম্পর্কে ?"

"কিছুই না।"

"তাহলে একথা বললে কী করে ?"

"মনে হল। একটা অবিবাহিত ছেলে বছরে লাখটাকা কামাচ্ছে, দায়দায়িত্ব বলে কিছু নেই, মানছি তারও যন্ত্রণা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা আমার সমান নয়, হতে পারে না। আমাকে এই জীবনে আসতে হল কেন ? সেটা বোঝার ক্ষমতা তোমার আছে কি ? তুমি যদি মেয়ে হতে আর কোন পুরুষ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করত…"

"থাক থাক, আর বলতে হবে না।" জ্যোতি রুক্ষস্বরে বলে উঠল গৌরীকে থামিয়ে দিয়ে। ভ্রূ-কুঁচকে গৌরীকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে মুখটা ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের গলার স্বর নিজের কানেই তার খারাপ লেগেছে।

"চান করতে হবে।" অপ্রতিভ বোধটা কাটিয়ে ওঠার জন্য খাপছাড়া ভাবে কথাটা বলে সে ঘরের লাগোয়া স্নানের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে তাকিয়ে, দরজা বন্ধ করল।

"আশ্চর্য, তোয়ালেটাও রাখেনি।"

জামাটা খুলে খাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে জ্যোতি স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গৌরীর কথাটা এখনো ঝিমঝিম করছে তার মাথায়।

'তুমি যদি মেয়ে হতে আর কোন পুরুষ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করত···কোন পুরুষ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করত···বিশ্বাসঘাতকতা···করত···'

অনেক দিন আগে, অনেক দিন আগে, উষা···এই নামে একটা মেয়ে, ছোটবেলা থেকে জ্যোতি তাকে চেনে। পুকুরপাড়ের সরু পথটা দিয়ে রাস্তায় পড়লেই উষাদের একতলা বাড়ি। ওর বাবা সুবিনয় ভট্টাচার্য রেশনের দোকানে চাকরি করতেন আর বাকি সময় ব্যস্ত থাকতেন পুরোহিতের কাজে। ওর চার বছর বয়সে মা নিরুদ্দেশ হয়। দূরসম্পর্কের এক বৃদ্ধা পিসিকে ওর বাবা এনে রাখেন। বছর দশেক পর পিসি মারা যান। তারপর থেকে বাড়িতে শুধু বাবা আর মেয়ে।

উষা তার থেকে এক বছরের ছোট। সকালের স্কুলে পড়ত। সে যখন স্কুল থেকে ফিরত জ্যোতি তখন স্কুলের দিকে যাচ্ছে। পথে দেখা হত, দু-চারটে কথা হত আর চিঠি বিনিময়।

তারপর জ্যোতি কলকাতায় প্রথম ডিভিশনে ফুটবল খেলতে গেল। প্রথম বছরেই তার গোলে মহমেডান স্পোর্টিং হারল, ইস্টবেঙ্গল আর সারথি সংঘের সঙ্গে ড্র হল। সেই বছরই অরবিন্দ মজুমদার সারথির কোচ হয়ে এসেছেন। খেলার পর তাঁবুতে নিজের ঘরে জ্যোতিকে ডেকে আনিয়ে কোন ভণিতা না করেই বলেছিলেন, "সামনের বছর সারথিতে এস। তোমার গোলটা নিশ্চয়ই দারুণ হয়েছে কিন্তু অনেক ত্রুটি আছে তোমার খেলায়, মাজাঘষা দরকার। ভাল প্লেয়ার পাশে না পেলে তুমি ডেভেলাপ করতে পারবে না। ছোট টিমে খেলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আসবে আমার ক্লাবে?"

"মাত্র এই বছরই গড়ের মাঠে খেলছি।" জ্যোতি বলেছিল, "এখনো কিছুই জানি না, বুঝি না। বড় ক্লাবে গিয়ে অনেককেই তো সাইড লাইনের ধারে সারা সিজন বসে থাকতে দেখেছি। আমি বসে থেকে পচে যেতে চাই না।"

"আমি যখন তোমাকে যেচে ডেকে আনছি তখন এটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ বসিয়ে রাখার জন্য ডাকছি না। আমার কলেজেরই সহপাঠী তোমার স্কুলের টিচার বিপিন গোস্বামী আমাকে মাসখানেক আগে চিঠি দিয়ে তোমার কথা বলেছিল। তোমার চারটে ম্যাচ আমি তারপর দেখেছি। এর মধ্যে যদি মোহনবাগান বা

www.BanglaBook.org

ইষ্টবেঙ্গল তোমার সঙ্গে কনট্যাক্ট করে না থাকে, নিশ্চয়ই করেনি, তাহলে আমি তোমাকে অফার দিচ্ছি।"

জ্যোতি হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। শুধু বলেছিল, ভেবে দেখব। বিপিন স্যার যে চিঠি দিয়েছেন একথা উনি ঘুণাক্ষরেও তাকে বলেননি। তবে অরবিন্দ মজুমদার যে তার সঙ্গে কলেজে পড়তেন কয়েকবার সেটা বলেছিলেন। মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তার প্রথম আবিষ্কর্তাকে। বিপিনস্যার তার ফুটবল কোচ, তার প্রথম প্রকৃত বন্ধু। তাকে পরামর্শ দিয়ে চালনা করেছেন যখন সে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করেছে। বিপদের সময়ও পাশে দাঁড়িয়ে অভয় দিয়েছেন। আর সেই বিপদও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন এসেছিল যেদিন উষা জানলা থেকে ডেকে তাকে দাঁড় করিয়ে আতঙ্কিত মুখে তাকে কথাটা জানাল। তারপর কাতরস্বরে বলেছিল, "জ্যোতি আমাকে বিট্রে করো না।"

স্নানঘরের দরজায় খটখট শব্দটা অনেকবার হয়েছে। শাওয়ারের নীচে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে জ্যোতি সাত বছর পিছিয়ে স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকায় শুনতে পায়নি, অবশেষে খুব জোরে ধাক্কা পড়তে তার হুঁশ ফেরে।

"কে?"

"আমি। তাড়াতাড়ি কর, আমাকেও চান করতে হবে।"

তোয়ালে নেই ভেজা গায়েই প্যান্ট পরে সে বেরিয়ে এল। মাথার চুল থেকে জল ঝরছে।

"দেখি, মাথাটা নিচু কর।"

বাধ্য ছেলের মতো জ্যোতি মাথা নামাল। গৌরী আঁচল দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, "হঠাৎ মেজাজটা বদলে গেল যে? তোমার অরবিন্দদার জন্য?"

জ্যোতি ভাল সেন্টের ফিকে গন্ধ পেল গৌরীর শরীর থেকে। স্নান করবে বলে ব্লাউজটা খুলেছে। পাতলা শাড়ির আড়ালে স্তনের নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে। জ্যোতি তার ঠোঁট চেপে ধরল স্তনাগ্রে এবং হাঁ করে কিছুটা মুখে পুরে হালকাভাবে দাঁত বসাল।

"কি হচ্ছে কি?" মাথা মোছা থামিয়ে গৌরী কৃত্রিম ধমক দিল।

"তোমারও মেজাজ খারাপ হয়েছে। তোতনের জন্য?"

"স্বাভাবিকই।"

গৌরী স্নানঘরে ঢুকল। জ্যোতি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"একমাত্র ছেলের প্রাণ যখন বিপন্ন হয় তখন কোন্ মা মেজাজ ঠিক রাখতে পারে ?"

জ্যোতির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে গৌরী শাড়ি খুলে আলনায় রাখল। সায়া খোলার সময় মুখ তুলে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "লজ্জা পাচ্ছ ?"

"না না লজ্জা পাব কেন, টেণ্টে ড্রেসিংরুমে তো উদোম হয়ে থাকিই।"

"সেখানে মেয়েরা তো থাকে না।"

গৌরী শাওয়ার খুলে, চুল বাঁচাতে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল। জ্যোতির চাহনিতে তারিফ ফুটে উঠল। বছর পাঁচেক আগেও যে শরীর দেখেছে আজও তা অটুট রয়েছে। খাওয়ার এবং ব্যায়ামের ব্যাপারে গৌরী কঠোর নিয়ম মেনে চলে। "বল আমার ফিগারটা কেমন ?" প্রথমবার যখন গৌরী নগ্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করেছিল জ্যোতি তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছিল। সে ভাবতেও পারেনি এত স্বচ্ছন্দে কোন মেয়ে একের পর এক বস্ত্র শরীর থেকে খুলে ফেলতে পারে প্রায় অপরিচিত কোন পুরুষের সামনে, তাও ঘরে আলো জ্বলছে !

"মুখে কথা নেই কেন ? শুনেছি তুমি ফুটবলকে দিয়ে নাকি কথা বলাও !"

"দাশুদা বলেছে ?"

"তাছাড়া আর কে ?"

"দাশুদা তোমায় ফিট করেছে আমাকে পুরুষ মানুষ করে তুলতে ?"

"তুমি তো পুরুষই, করে আবার তুলব কি ?"

গৌরী এগিয়ে এসে তার বুকে হাত রেখে বলে, "দাশুদা বললেই সব কাজ আমি করব, এমন কোন কথা আছে কি ? আমারও তো ইচ্ছা অনিচ্ছার, ভাল লাগার ব্যাপার আছে।"

"এজন্য দাশুদা তোমাকে টাকা দেবে ?"

"কতটা বীয়ার খেয়েছ ?"

"আড়াই বোতল—বললে না তো দাশুদা টাকা দেবে কি না ?"

দু হাতে গলা জড়িয়ে, মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিল, "না। দিলেও নেব না। একেবারে ভলাণ্টারি সার্ভিস।" তারপর ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, "তুমি তো বললে না আমার ফিগার কেমন লাগল ?"

গলা শুকিয়ে আসছিল। ঢোঁক গিলে জ্যোতি শুধু বলেছিল 'ভাল।'

"শুধুই ভাল, হাত দাও গায়ে, যেখানে খুশি।"

জ্যোতি হাত রেখেছিল কাঁধে। আঙুলগুলো তখন কাঁপছিল। চোখে চোখ

www.BanglaBook.org

রাখতে গিয়েও পারছিল না। গৌরীর মুখ টিপে হাসিটার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না : বাচ্চা, নাবালক, অপদার্থ।

কোমরের বেল্ট ধরে গৌরী বলেছিল, "এগুলো এবারে হঠাও।"

"না।" আর্তনাদ করে উঠেছিল জ্যোতি। "আলো জ্বলছে !"

হাসতে হাসতে গৌরী কুঁজো হয়ে যায়। "এই যে বললে ড্রেসিংরুমে—"

জ্যোতি ছুটে গিয়ে সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দিয়েছিল। তারপর অত্যন্ত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যায়। একটা নব্বুই মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচের পর মাথা যেরকম ঘোরের মধ্যে থাকে, বুকের মধ্যে কলজেটা দপদপায়, চোখে ঝাপসা লাগে, অনুভব ক্ষমতা কমে যায় প্রায় সেই রকমই তার মনে হয়েছিল। স্বপ্নের মত অনেক দূরের ব্যাপার যেন, যত চেষ্টা করে কাছে যেতে ততই সুদূরের মনে হয়েছিল। মহাশূন্যে যেন ভেসে যাচ্ছিল গৌরীর দেহটাকে আঁকড়ে ধরে। অস্পষ্ট গোঙানি, মর্মর ধ্বনির মত হালকা কথা, ভারী নিশ্বাস পাচ্ছিল গৌরীর কাছ থেকে। অবশেষে একটা তরঙ্গ তার সারা শরীর বেয়ে নেমে তাকে নির্জীব, অসহায় অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

যখন গভীর নিঃশ্বাস নিতে সে অকাতরে ঘুমের জন্য প্রার্থনা করছিল সেই সময় গৌরী বলেছিল, "আমিই কি প্রথম ?" সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সব কটা পেশী শক্ত হয়ে উঠেছিল। একথা বলল কেন ? ও কি টের পেয়ে গেছে ? গৌরীর এ ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। হয়তো তার শরীর থেকে কিছু বুঝে নিয়েছে। তখন চোখে ভেসে উঠেছিল উষার মুখ। গৌরীকে সে বলতে যাচ্ছিল, না তুমি দ্বিতীয়। বলতে পারেনি, আজ পর্যন্ত কাউকেই বলতে পারেনি শুধু বিপিন স্যারকে ছাড়া।

শাওয়ার বন্ধ করে ভিজে শরীরেই গৌরী সায়াটা পরতে যাচ্ছিল। জ্যোতি বলল, "দাঁড়াও, বেডকভারটা দিয়ে গা মুছিয়ে দি।"

ছুটে গিয়ে বেড কভারটা এনে সে গৌরীকে প্রায় মুড়ে জল শুষে নেবার জন্য পা থেকে গলা পর্যন্ত চেপে দিল।

"তুমি এখন কোথায় যাবে ?" জ্যোতি বলল।

"পার্ক সার্কাসে যাব, ঘর দেখতে।" গৌরী চিরুনি দিয়ে চুল ঠিক করছিল। আয়না সামনে।

"ঘর ? কার জন্য ?"

"আমার জন্য। ফ্ল্যাটের এত ভাড়া আর আমি টানতে পারব না। এখন

আমাকে ধার শোধের কথা ভাবতে হবে। তোতনের জন্য বছর বছর খরচের টাকাটা একরকম ভাবে এত কাল ম্যানেজ করেছি কিন্তু এই অসুখটার ধাক্কা—"

কাতর, অসহায় চোখে গৌরী তাকিয়ে আছে। ওর কঠিন, স্বচ্ছন্দ, বাস্তববোধ গলে গলে ধুয়ে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে দিশেহারা একটি কোমল অন্তঃকরণ।

"খুবই কি ভয় পাওয়ার মত অসুখ?"

"ডাক্তার তো বলছেন, এ সব অপারেশন এখন আকছারই হচ্ছে। তবে খরচ খুব।"

"টাকার জন্য কারুর কাছে তুমি চেও না, আমি দেব।"

গৌরীর অবাক এবং বিভ্রান্ত চোখ জ্যোতিকে খুশি করল। তারপরই অনুযোগের স্বরে সে বলল, "তোমার তো আমাকেই প্রথম বলা উচিত ছিল। হঠাৎ আজ দেখা হল তাই, নইলে আমি তো জানতেই পারতাম না!"

"কাউকে আমি জানাতে চাই না। তোতন আমার নিজস্ব, আমার সব কিছুই ওর জন্যই, শুধু ওর জন্যই। আমি আবার বিয়ে করতে পারতাম, দুটি লোক চেয়েছিল, কিন্তু করিনি। মনে হয়েছিল খুব নির্ভরযোগ্য নয়, তাছাড়া তোতনও সেটা মেনে নিতে পারবে না।"

"কিন্তু এখন যা করছ সেটা তো একদিন জানতে পারবে!"

"আমি সরে যাবার চেষ্টা করছি। চাকরি বাকরি পাওয়া আমার পক্ষে শক্ত, চেহারাটা ছাড়া কোন যোগ্যতাই নেই। সিনেমায় চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। স্টেজে চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাত্রায়ও। মডেলিং লাইনে আছে এমন কয়েকজনকে চিনি, এবার দেখি ওখানে কিছু হয় কি না।"

"কবে তোমার টাকার দরকার?"

"ভেলোর ঘুরে আসি তারপর বলব। কিন্তু অত টাকা দিতে তোমার অসুবিধা হবে না তো?"

"দশ বিশ হাজার যখন তখন দেবার ক্ষমতা আমার আছে।" কথাটা বলেই জ্যোতির হাসিমুখটা হঠাৎ পাংশু হয়ে গেল। জগামালীর মাঠের ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিপিন স্যার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, "জ্যোতি, ডাক্তার পাঁচশো টাকা চাইছেন, যোগাড় করতে পারিস?" শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। "স্যার, এত টাকা এখন কোথায় পাব!" যেখান থেকে পারিস যোগাড় কর, নয়তো উষার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার কাছেও তো অত টাকা নেই যে দেব।"

www.BanglaBook.org

"একটু সময় লাগবে শোধ দিতে।" গৌরীর সারা শরীরে অনুনয়ের সঙ্গে কাতর আবেদন। জ্যোতি বিষণ্ণ বোধ করল। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য হালকা ফাজিল স্বরে বলল, "আরে সেজন্য ভাবতে হবে না।" গলার স্বর নামিয়ে বদমাইসী চাহনি নিয়ে তারপর বলল, "তুমিই তো আমায় পুরুষ মানুষ করে দিয়েছ।"

"বটে! পুরুষ মানুষ হয়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে।"

জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল। গৌরীর কথার মধ্যে কি যে এক ইঙ্গিত রয়েছে, বারবার কেন জানি উষাকেই মনে পড়ছে। সে কোথায় এখন? বাড়িটা বিক্রি করে মেয়েকে নিয়ে সুবিনয় ভট্টাচার্য কোথায় যে মিলিয়ে গেলেন! আর সে নিজেও কেন যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল অরবিন্দ মজুমদারের কাছে! অবশ্য তখন সে জানত না একদিন লোকে 'সারথির সারথি' বলে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, আদরে তাকে উল্লেখ করবে।

"নান্টু দই এনেছে, একটু খেয়ে যাও।"

"এক চামচও নয়, একদম উপোস। আমি এখন যাই।" ঘড়ি দেখল গৌরী। "আমার পৌঁছবার টাইম হয়ে গেছে। বাড়িঅলা অপেক্ষায় থাকবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করলে প্রথমেই একটা ব্যাড ইম্প্রেশন হবে। চলি।"

জ্যোতি পিছু ডেকে বলল, "তোমাকে পাব কোথায় তাহলে?"

"আমাকে পেতে হবে না, বিখ্যাত লোক তো, আমিই তোমাকে খুঁজে নেব! গরজ তো এখন আমার। তুমি নিশ্চয় এখন একটা ঘুম দেবে, তারপর সিনেমা।"

"এক্স্যাকট্‌লি। এর মধ্যে দাশুদা এসে পড়লে তো ভালই।"

।। চার ।।

বিপিন স্যার ডাকছেন। জ্যোতি অবাক হয়ে গেছল বেয়ারা কাশিদা যখন টিফিনে খবরটা দেয়।

টিচার্স রুমের জানলার কাছে বসেছিলেন বিপিন স্যার।

"জ্যোতি, হাবড়ায় পরশু স্কুলের খেলা মাধবপুরের সঙ্গে, খেলতে পারবি?"

"স্যার!..." জ্যোতির মুখ থেকে আর কোন শব্দ বেরোয়নি।

"তোর বয়সটা খুবই কম, অভিজ্ঞতাও নেই। আপত্তি উঠবেই। তাহলেও আমি তোকে টিমে রাখব। অন্য ছেলেরা কম করেও তোর থেকে তিন-চার বছরের বড়। ঘাবড়ে যাবি না তো?"

"না স্যার।" জ্যোতি ঢোঁক গিলতে গিলতে বলে।

"তরুণ কাল জ্বরে পড়েছে। একটু আগে ওর কাকা খবর দিয়ে গেল একশো তিন জ্বর উঠেছে। ওর জায়গায় ফরোয়ার্ডে তোকে খেলতে হবে। রিজার্ভে অবশ্য পলাশ আর বঙ্কু আছে, কিন্তু···যদি না পারবি তো বলে দে, তাহলে পলাশকে নামাব।"

"না না স্যার পারব।"

বোঁ বোঁ ঘোরা মাথা নিয়ে জ্যোতি ক্লাসে ফিরেছিল। স্কুল টিমে চান্স পাওয়ার কথা সে এখনো ভাবতে পারে না। দিল্লিতে সুব্রত কাপ খেলার জন্য অঘোরচন্দ্র বিদ্যাসদন গত পাঁচ বছর চেষ্টা করে ব্যর্থ। বাংলার আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাতেই উঠতে পারেনি। বিপিন স্যার গোঁ ধরে রয়েছেন স্কুলকে দিল্লিতে নিয়ে যাবেনই। ঘুরে ঘুরে ফুটবল খেলা দেখে বেড়ান। ভাল প্লেয়ার বুঝলে ধরে-বেঁধে স্কুলে এনে ভর্তি করান। তাদের অধিকাংশই স্কুলে ক্লাসে আসে না। কোথায় যে তাদের বাড়ি তাও জ্যোতি জানে না। অনেককেই প্রতিদিন দাড়ি গোঁফ কামাতে হয়। অথচ সতেরো বছরের বেশি বয়সীদের খেলার নিয়ম নেই।

"রাখ তোর এজ-লিমিট। কটা স্কুল মানছে এসব নিয়ম? ছাখ গিয়ে দু ছেলের বাপও সুব্রত কাপের ফাইনালে খেলছে।" কথাটা বলেছিল তরুণই। ওর বয়স কমপক্ষে একুশ।

তরুণ মাঝে মাঝে ক্লাস করে। এজন্য কোন শিক্ষক কিছু বলেন না। প্রতি বছর ক্লাস পরীক্ষায় পাস হয়ে গেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিন বছর ফেল করেছে। জ্যোতি ওকে সকালে মেয়ে স্কুলের সামনে সঙ্গীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখেছে। ঊষা বলেছিল, গায়ে পড়ে তার সঙ্গে তরুণ কথা বলার চেষ্টা করে। অবশ্য সে পাত্তা দেয়নি।

একদিন তরুণ তাকে বলেছিল, 'এই জ্যোতি, তোর সঙ্গে ঊষার অত ভাব কেন রে? রোজই কথা বলিস, লাইন করেছিস?" "আমার পাড়ার মেয়ে" জ্যোতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে সরে যায়।

হাবড়ায় তিনটি লীগ ম্যাচ। সেখান থেকে উঠতে পারলে আন্তঃ অঞ্চল প্রতিযোগিতায় খেলতে হবে। কোথায় যে সেটা হবে জ্যোতি জানে না। গত বছর শিলিগুড়িতে হয়েছিল। কিন্তু আন্তঃ অঞ্চল নয়, জ্যোতির মাথায় এখন পরশুর খেলা ঘুরপাক খাচ্ছে। রাত্রে সে অন্ধকারে জগামালির মাঠে টানা আধ ঘণ্টা চক্কর দিয়ে দৌড়ল, না জিরিয়ে। নিজের ফুটবল নেই। বিপিন স্যারের

www.BanglaBook.org

বাড়িতে স্কুলের জার্সি, ফুটবল ইত্যাদি থাকে। সকালে সে বল চাইতে গেল। বিপিন স্যার দিলেন না। "নিজেকে টায়ার্ড করিসনি। বিশ্রাম নে। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না।"

রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। মাধবপুর হাইস্কুল গোবরডাঙ্গা এলাকায়। এই মাঠ তাদের অপরিচিত নয়। মাঠ অসমান, অল্প জায়গাতেই ঘাস রয়েছে। পেনাল্টি এলাকায় বিশেষ করে গোলের সামনে কাদা। মাঝে মাঝে জোরালো হাওয়া বইছে। মাঠ এবং মেঘলা আবহাওয়া জ্যোতির পছন্দের নয়। তার সূক্ষ্ম ছোঁয়ার জন্য দরকার খটখটে ঝকঝকে মাঠ আর মৃদু বাতাস।

কাদাই তাকে মুশকিলে ফেলে দেয়। এড়াতে হলে পেনাল্টি এলাকার বাইরে তাকে খেলতে হবে অর্থাৎ শট নিতে হবে দূরপাল্লার। প্রথমার্ধে বাতাসের সাহায্য পেলেও, বলের জন্য তাকে ছ'-সাত মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। মাধবপুর গোঁয়ারের মত খেলছে। কোনক্রমে বাতাসের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধ কাটিয়ে, দ্বিতীয়ার্ধে সুবিধা নেবার পরিকল্পনা নিয়ে ওরা খেলছিল। বল ধরে রেখে সময় কাটাচ্ছিল মাধবপুর।

হতাশ হয়ে পড়ছিল জ্যোতি। ডিফেন্সকে সাহায্য করার জন্য নেমে গিয়ে খেলছে তার রাইট আউট নবারুণ। ডানদিকটা একদম ফাঁকা পড়ে আছে। একবার যদি একটা বল সে পায় তাহলে চড়চড় করে সে গোলের দিকে এগোতে পারবে। দু'-তিনবার হাত তুলে সে বল চাইল। কিন্তু কেউ নজরই করল না। ভাবল চেঁচিয়ে বল চাইবে। কিন্তু টিমে এই প্রথম সে বড় ছেলেদের সঙ্গে খেলছে, যদি ওরা বিরক্ত হয়! যদি বল নিয়ে কিছু একটা করতে না পারে তাহলে ওরা বিপিন স্যারকেই দুষবে, এমন একটা অপদার্থকে নামাবার জন্য।

অবশেষে সে বল পেল। নিজেদের কারুর দেওয়া পাস থেকে নয়। মাধবপুরের স্টপার একটা জোরালো শট নিতে যায়। বলটা তার বুটে কেটে গিয়ে সোজা আসে জ্যোতির কাছে। তার ধারেকাছে কেউ নেই। বলটা পেয়েই সে তরতরিয়ে গোলের দিকে ছোটে মাঠের শুকনো জায়গা ধরে। মাধবপুরের চারজন ছুটেছে তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তারা পৌঁছবার আগেই পেনাল্টি এলাকার কিনার থেকে ডান পায়ে জমিঘেঁষা শট নিয়ে দ্বিতীয় পোস্ট ঘেঁষে বল গোলে পাঠায়, এগিয়ে আসা গোলকিপারের ডানদিক দিয়ে।

ওরা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে, কেউ কেউ চুমুও খায়। "দারুণ শটটা নিয়েছিস," "আর একটা গোল দে" "তুই এত ভাল শট নিস!" জ্যোতি মাঠের বাইরে একজনকে ছাতা নাড়তে দেখেছিল। বিপিন স্যার।

এরপর তার কাছে বল আসতে শুরু করে। সে যে কিছু করতে পারে এটা দেখিয়েছে, ওরা চায় আবার করে দেখাক। জ্যোতি হতাশ করেনি। পনেরো গজ দূর থেকে একটা শট গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে ডীপ করে গোলে ঢোকে। দ্বিতীয়ার্ধে কর্ণার থেকে হেড করে সে তৃতীয় গোলটি করে। হ্যাটট্রিক!

বাড়ি ফেরার সময় বাস থেকে নেমে নাইলন জালের থলিতে রাখা চারটি বলের একটা বার করে বিপিন স্যার তার হাতে দিয়ে বলেন, "এই নে।"

জ্যোতিকে অবাক হতে দেখে বলেন, "এটা তোকে দিলাম।"

"দিলাম!...একেবারে?"

"হ্যাঁ।"

জীবনে এই প্রথম তার নিজস্ব ফুটবল। অবাক হয়ে সে বলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরে। তার মনে হচ্ছিল একটা বেড়াল যেন পাকিয়ে গোল হয়ে বলে রূপান্তরিত হয়েছে। দু হাতে সে বলটাকে আদর করে।

দ্বিতীয় ম্যাচ দক্ষিণেশ্বরের রাজা প্রাণকৃষ্ণ স্কুলের সঙ্গে। খেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দু' দলই বলের পিছনে তাড়া করে অদ্ভুত তালগোল পাকান অবস্থা তৈরি করে ফেলল। দু' দলের স্টপাররা ছাড়া আর সবাই গোঁতাগুতিতে মেতে গেছে। জ্যোতি ভীড় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখল। প্রথমার্ধ শেষ হল গোলশূন্য থেকে।

গ্লুকোজ জল খাবার সময় বিপিন স্যার একটা কথাই শুধু তাকে বলেন, "একটু স্কিল দরকার। মাঠের মাঝখানে জড়াজড়ি হচ্ছে। ডানদিকটা ফাঁকা পড়ে। ফাঁকা জায়গা কাজে লাগা।"

দ্বিতীয়ার্ধে জ্যোতি তাই করল। বলটা এর পায়ে তার পায়ে হয়ে ঘুরছে লাফাচ্ছে। সে হঠাৎ ভিতরে এসে বল ধরেই ইনস্টেপে প্রাণকৃষ্ণ স্কুলের তিনজনের মাথার উপর দিয়ে ফ্লিক করে, নিজেই ছুটে গিয়ে বলটা ডানদিকে ধরল। সামনে তাকিয়ে দেখল লেফট ব্যাক এগিয়ে আসছে বুনো মোষের মত। তার পিছনে, একই লাইনে গোলকীপার ছাড়া আর কোন ডিফেণ্ডার নেই।

জ্যোতি বলটাকে ডান পায়ে বাঁ পায়ে করল বিদ্যুৎ ঝলকের গতিতে। লেফট ব্যাক থমকে যেতেই তার পাশ দিয়ে বল নিয়ে বেরিয়ে ছুটল পেনাল্টি এলাকার দিকে। এখন শুধু গোলকিপারকে হার মানানো, গোলের মুখ ছোট হয়ে এসেছে। গোলকিপার যদি বেরিয়ে আসে তাহলে মাথার উপর দিয়ে বলটা লব করে দেবে অথবা বল নিয়ে সরে যাবে বাঁদিকে। কিন্তু গোলকিপার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শটের অপেক্ষায়।

www.BanglaBook.org

শট নিলে সহজেই পাঞ্চ করে বল সরিয়ে দেবে, এটা বুঝতে পেরেই জ্যোতি গোলকিপারের ছ' গজের মধ্যে পৌঁছেই গমনপথটা বদলে গোলের মাঝের দিকে এত দ্রুত সরে গেল যে, গোলকিপার বিপদ যখন বুঝতে পারল তখন দেরী হয়ে গেছে। ডান পায়ে বলটা ঠেলে বাঁ পায়ে জ্যোতি সুইং করিয়ে গোলে মারল। ঝাঁপান গোলকিপারের আঙুল ছুঁয়ে উপরের জালে বল আটকাল।

ফুটবল শিল্পের সঙ্গে সম্পর্করহিত এই ম্যাচে একবারই সে মায়াবী একটা মুহূর্ত তৈরি করে দিয়েছিল। এ গোলে জ্যোতির স্কুল জেতে। গোল দেবার পরই মাঠের বাইরে একটা ছাতাকে পতাকার মত নাড়তে দেখার আশা নিয়ে সে তাকায়। নিরাশ হয়নি।

দুটি ম্যাচে চারটি গোল। অঘোরচন্দ্র আন্তঃ আঞ্চলিক খেলছেই জ্যোতির জন্য। স্কুলের প্রায় বারশো ছেলের চোখ তার উপর পড়ল। এখন সে স্কুল হিরো।

তরুণ পরদিনই স্কুলে এল। তার জ্বর সেরে গেছে। তৃতীয় ম্যাচে সে খেলতে চায়।

"কার জায়গায় খেলবে? জ্যোতিকে তো বসাবার প্রশ্নই ওঠে না, আর অন্য কাউকে বসিয়ে যে তোমায় খেলাব তেমন খারাপ কেউই খেলেনি। যদি কারুর ইনজুরি হয়, অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বরং তোমাকে নেয়া যাবে।"

বিপিন স্যারের কথা শুনে কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে তরুণ চলে যায়।

পরদিন ভোরে, যখন সূর্যের আভাটুকু মাত্র আকাশে লেগেছে, কাকপক্ষিরা বাসার আড়মোড়া ভাঙছে গাছের ডালে বসে, দূরের মানুষকে আবছা দেখাচ্ছে, এমন সময়ে জ্যোতি জগামালির মাঠে এল প্র্যাকটিসের জন্য। হাতে উপহার পাওয়া বলটা।

মাঠের মাঝামাঝি বলটা রেখে দিয়ে সে চক্রাকারে মাঠের কিনারা দিয়ে ছুটতে শুরু করল। এটা তার প্রতিদিনের কাজ। ঝড়-জল-বৃষ্টিতেও সে কামাই দেয় না। তার শরীরটা শীর্ণ বটে কিন্তু ফুসফুসের ক্ষমতা তার চেহারা থেকে বোঝা যায় না।

জ্যোতি চিবুক তুলে সামনে তাকিয়ে ছুটে যাচ্ছিল তাই লক্ষ্য করেনি চারটি ছেলে কখন মাঠের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা মন্থরগতিতে মাঠের মধ্যে এসে বলটা নিয়ে পায়ে পায়ে নাড়াচাড়া করছে. তখন জ্যোতি দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

"কি হচ্ছে?"

"কি আবার হবে, খেলছি।" রুক্ষস্বরে একজন বলল, এদের তিনজনকে জ্যোতি চেনে। তরুণের সঙ্গে সকালে মেয়ে স্কুলের সামনে বসে থাকে।

"থাক্, খেলতে হবে না।"

"খেলব না কি রে ব্যাটা, তোর বাবার বল? এটা স্কুলের বল।"

"তোমরা স্কুলে পড় নাকি?"

"পড়ি কি না পড়ি সেটা কি তোকে বলতে হবে?"

"দিয়ে দাও।"

জ্যোতি ঝুঁকে বলটা কুড়িয়ে তুলতেই একজন তার বল-ধরা তালুতে লাথি কষাল। বলটা ছিটকে গেল। সে ছুটে যাচ্ছিল বলটা ধরার জন্যে। সেই সময় একজন পা বাড়িয়ে তার পায়ে আলতো লাথি মারতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দ্রুত উঠে দাঁড়ান মাত্র তার পাছায় এবং উরুতে দুজন লাথি মারল। সে আবার পড়ে গেল। ওদের প্রত্যেকের পায়ে শক্ত চামড়ার জুতো।

এরপর মিনিট খানেক ওই চারজন মাঠে ছিল, জ্যোতির চিৎকার শুনে পথ দিয়ে যাওয়া দুজন লোক এগিয়ে না আসা পর্যন্ত। তারই মধ্যে একজন ওর কাঁধে, আর একজন কোমরে লাথি মেরে চলে। আর একজন পায়ের গোছের উপর দাঁড়িয়ে শরীরের সবটুকু ভার চাপিয়ে লাফাতে থাকে।

চারজন ধীরে সুস্থেই রাস্তায় নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়। লোক দু'জন জ্যোতিকে হাত ধরে টেনে তোলে। কয়েক পা এগিয়েই সে কাৎরে উঠে পায়ের যন্ত্রণায় বসে পড়ে।

তার প্রথম চিন্তা হয় বলটার জন্য। হামা দিয়ে সে কুড়ি মিটার গিয়ে বলটা দু হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এরপর ভয় হয় বাড়ির কথা ভেবে। পড়ার বদলে ফুটবল খেলার জন্য বাবার আপত্তির কিছু কিছু চিহ্ন তার কপালে, বাহুতে, পায়ে জলজলে হয়ে রয়েছে। এখন এই অবস্থায় বাড়ি ফিরলে এই যন্ত্রণার উপর আরো কিছু যন্ত্রণা নিতে হবে।

ওরা মারল কেন, তা বুঝতে জ্যোতির মাথা খাটাতে হল না। পরের ম্যাচে তার খেলা বন্ধ করতে চায়। তার ইনজুরি হলে তরুণ নামতে পারবে। একমাত্র পায়ের গোছের আর কাঁধের আঘাত ছাড়া খুব বেশি তার লাগেনি। দুটো দিন সে হাতে পাচ্ছে, এর মধ্যে কি ঠিক করে ফেলতে পারবে না? যেভাবেই হোক পারতেই হবে। ওদের দেখিয়ে দিতে হবে, এভাবে মেরে তাকে দাবান যায় না, যাবে না।

www.BanglaBook.org

একটা রাগ দপদপ করে উঠল তার শরীরের মধ্যে। শিরাগুলোর মধ্য দিয়ে গরম স্রোত ছড়িয়ে পড়ল, কোষে কোষে। জ্যোতির পা থেকে কিছুক্ষণের জন্য যেন বেদনা মিলিয়ে গেল। সে কখন যে হাঁটতে হাঁটতে ঊষাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে খেয়াল করেনি।

"কি ব্যাপার, এত সকালে?"

ঊষা স্কুলে যাবার জন্য তৈরি। খয়েরি স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ, টেনে চুল বাঁধা, খয়েরি টিপ, কানে ছোট্ট সোনার রিং।

"কি হয়েছে তোমার? খোঁড়াচ্ছ কেন?"

"একটু চুণ-হলুদ যদি করে দিতে। প্র্যাকটিস করতে গিয়ে গর্তে পা'টা মুচকে গেল।" মার খাওয়ার ব্যাপারটা সে চেপে গেল।

ঊষা আর স্কুলে যায়নি সেদিন। ধারে কাছে বরফ না পাওয়ায় তার বাবা সুবিনয় বাসে ব্যারাকপুরে গিয়ে বরফ কিনে আনেন। সারা সকাল বরফে আর গরম জলে পাল্টাপাল্টি করে ডান পায়ের শুশ্রূষা করে যায়।

"ঊষা, বাড়িতে যেন না জানতে পারে। তাহলে বাবা মেরে ফেলবে।"

"না, বলব না। তুমি বরং এখানেই দুপুরে শুয়ে থাক। আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসছি।"

"না না, একদম নয়। এখানে আছি বলো না। বরং বলে এসো স্কুলে আজ ফাংশন আছে, স্টেজ তৈরি করছে বলে আটকে পড়েছে। অবশ্য দুপুরে বাড়ি না ফিরলে মা কিছু মনে করবে না, ভাতটা বেঁচে গেল তো!"

ব্যথাটা কমে গেল বিকেলের মধ্যেই। ঊষার কাঁধ ধরে জ্যোতি ঘরের মধ্যে চলাফেরা করল। ডান পায়ে শরীরের ভর রেখে দেখল ব্যথা কম লাগছে।

"তোমার জন্যই সম্ভব হল।" কৃতজ্ঞ স্বরে সে ঊষাকে বলেছিল। "খুব ইম্পর্ট্যান্ট এই ম্যাচটা, আমার কাছে।"

খুশিতে ঝকঝকে হয়ে ওঠা ঊষার মুখটা তখন তার কাছে পৃথিবীর একমাত্র সৌন্দর্য বলে মনে হল। সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

"যদি খেলতে পারি, তাহলে তোমার জন্যই পারব। চ্যালেঞ্জ দিয়ে এই ম্যাচটা খেলব।"

এরপরই সে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসে। ঊষাকে দু হাতে জড়িয়ে বুকের কাছে এনে তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ছাড়া ওই চুম্বনে আর কিছু ছিল না। ঊষা চোখ বুঁজে ছিল, বাধা দেয়নি।

তারপর দুজনে দুজনের দিকে চোখ রেখে আর তাকাতে পারেনি। উষা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। জ্যোতি আচ্ছন্নের মত বসে থাকে।

জ্যোতি অবশ্যই তার 'ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাচটা' খেলেছিল। বিপিন স্যারকে কারা জানিয়েছিল জ্যোতির পায়ে সিরিয়াস ইনজুরি হয়েছে। তিনি জ্যোতিকে ডেকে সব ঘটনা শোনেন। বলেছিলেন, "পারবি খেলতে?" জ্যোতি মাথা হেলিয়ে ছিল। "মুখে বল।" "হ্যাঁ পারব।" গম্ভীর স্বরে তারপর তিনি বলেন, "তুই খেলবি। এবার আমার পরীক্ষা। মানুষ চিনতে পারি কিনা এবার জানতে পারব।"

পায়ের ব্যথা পুরো সারেনি কিন্তু গাঢ় গভীর ইচ্ছা দিয়ে সে নিজের শরীরকে যন্ত্রণার উপরে তুলে নিয়ে গেছল।

দুজন তার গায়ে আঠার মত লেগে ছিল সারাক্ষণ। তার হাঁটু, গোছ আর পাঁজর ছিল ওদের লক্ষ্যবস্তু। জ্যোতি সারা ম্যাচে দুবার শুধু তার প্রহরীদের শ্লথতার সুযোগ নিতে পেরেছিল। বল পায়ে তিরিশ গজ ছুটে সে নীচু স্কোয়্যার পাস দেয়। পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে গোপাল শট নিয়ে প্রথম গোল করে। সাত মিনিটের মধ্যেই গোল শোধ হয়ে যায়। খেলা শেষের চার মিনিট আগে জ্যোতি মাঝ মাঠে বল ধরে গোপালের সঙ্গে ওয়ান-টু-ওয়ান করে বাঁদিকে উঁচু ক্রস পাঠায়। সেখান থেকে ফেরত আসা বল বুকে ধরে জমিতে পড়ার আগেই বাঁ পায়ের ভলিতে জালে পাঠায়।

"স্যার, আপনি কি পাস করেছেন পরীক্ষায়?"

মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেই জ্যোতির প্রথম কথা ছিল এইটাই। বিপিন স্যার ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। উত্তর দেননি। দু চোখ চেয়ে টপটপ জল ঝরছিল।

রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় উষাদের বাড়ির সামনে সে দাঁড়ায়। ঘরে আলো জ্বলছে। সে দরজায় টোকা দেয়। জানলায় উষার মুখ উঁকি দিয়েই তাকে দেখে সরে গেল। দরজা খুলল।

"কি হল?" উদ্বিগ্ন মুখ, উষা প্রতীক্ষা করছিল।

"জিতেছি। উইনিং গোল আমার।"

রাস্তার উপরেই ঘর, খোলা দরজা, ঘরে আলো জ্বলছে। উষা হাত ধরে তাকে টেনে ভিতরে এনে দরজা বন্ধ করেই গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। এটা ঠিক কৃতজ্ঞতা জানাবার মত চুম্বন নয়। তবে তার থেকেও যে বেশি কিছু সেটা জ্যোতি এর মধ্যে অনুভব করে। কিন্তু সেটা যে কি, কোন দিনও সে বুঝে উঠতে পারেনি।

www.BanglaBook.org

॥ পাঁচ ॥

জ্যোতি মোটরবাইক রাস্তায় রেখে, বিপিন স্যারের বাড়ির দিকে এগোল। রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িতে দেখল ন'টা-কুড়ি। স্যারের এই সময় বই পড়ার অভ্যাস ছিল, হয়তো এখনো আছে। একতলা কয়েকটা বাড়ির পিছন দিয়ে সরু একফালি পথ। রেডিও এবং টি ভি চলছে। তাছাড়া সাড়াশব্দ নেই এবং অন্ধকার। ইঁটে ঠোক্কর লাগল। জ্যোতি অশ্রাব্য একটা গালাগাল দিয়ে উঠল। আগে যখন বাড়িগুলো ছিল না তখন কত সহজে সে স্যারের বাড়িতে আসত।

বিপিন স্যার ডেকেছেন কেন?

দূর থেকে জানলা এবং জানলার মধ্য দিয়ে সে স্যারকে দেখতে পেল। গেঞ্জির উপর হাতকাটা সোয়েটার, মাথাটা নীচু করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে। টেবল ল্যাম্পটা বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। ঘরটা আবছা অন্ধকার। দেয়ালে কাঠের পাটাতনে কিছু বই। এই ঘরে দিনের অধিকাংশ সময় তাঁর কাটে। বাইরের লোক আর ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলা বা খাতা দেখা, বই পড়া এই ছোট্ট ঘরেই।

"স্যার আমি জ্যোতি, ডেকেছেন?"

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলল। বিপিন স্যার ঘুরে তাকিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে চোখ সড়গড় করে নিয়ে বললেন, "দরজা খোলা আছে, আয়।"

ঘরের দ্বিতীয় চেয়ারটায় বসার পর জ্যোতি কৈফিয়ৎ দেবার স্বরে বলল, "কলকাতায় গেছলাম। অরবিন্দদার সঙ্গে..."

"কাগজে দেখলাম।" কিছুক্ষণ টেবিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, "দেখা হল?"

"না। বৌদিকে নিয়ে ভোরেই কোথায় চলে গেছেন। মনে হয় দেশের বাড়িতে। ভাবছি সেখানে একবার যাব।"

"কেন?"

জ্যোতি চট করে জবাব দিতে পারল না। কেন সে যেতে চায় সেটা তার কাছে পরিষ্কার নয়। কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করতে যেতে হয়। শোক পেলে সান্ত্বনা দিতে যেতে হয়। কিন্তু অরবিন্দদার ব্যাপারটা বিপদ বা শোকের পর্যায়ে পড়ছে না। এখন তাকে সাহায্য করারও কিছু নেই। যা হবার হয়েই গেছে।

সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে গেছল। ইংরাজী মারপিটের ছবি। সিনেমা হলে ঢোকার মুখে দেখা হয় অসিত আর বিষ্ণুর সঙ্গে। অসিত এগারো বছর ফার্স্ট

ডিভিশনে খেলছে। সারথি তার পঞ্চম ক্লাব। একবার মারডেকা টুর্নামেন্ট খেলে এসেছে। লেফট ব্যাক ছিল কিন্তু অরবিন্দদা ওকে লিঙ্কম্যান করেছেন। অসিত এজন্য অসন্তুষ্ট। বিষ্ণু এই বছরই সারথিতে এসেছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকে। ময়দানে অন্যতম উদীয়মান লেফট আউট। মোট ছ'টা পুরো ম্যাচ খেলেছে। সুবিধে করতে পারছে না।

ওদের দেখে জ্যোতি এগিয়ে গেল।

"দাশুদাকে দেখেছিস আজ?"

"দাশুদা? না।" অসিত অধৈর্য। শো আরম্ভ হতে এখনো দশ মিনিট বাকি। "তুইও কি বইটা দেখতে এসেছিস?"

"হ্যাঁ। ক্লাবে গেছলি?"

"গেছলুম। টাকা দেবে বলেছিল কিরণদা, দু হাজার। দিল না। এই নিয়ে তিনবার ঘোরাল। আমিও বলে দিয়েছি, রোভার্সে যাব না, প্র্যাকটিসেও আর আসব না। আরে বাঞ্চোৎটা বলে কিনা—ক্লাবের সব্বোনাশ হয়ে গেছে, মানসম্মান ধুলোয় লুটিয়ে গেছে আর তুই কিনা টাকা চাইছিস? শোন কথা, ক্লাবের মান আমি নষ্ট করেছি নাকি যে টাকা দেবে না? অরবিন্দ মজুমদার করেছে, সেজন্য তার পেমেন্ট আটকাও!"

"ক্লাব কি করবে বলে তোর মনে হল…অরবিন্দদা সম্পর্কে?"

"ক্লাবে গিয়ে তো মনে হল শ্মশানে মড়া নিয়ে সবাই বসে রয়েছে।" বিষ্ণু মুখ খুলল। "একি হল, একি হল! ক্লাবের চরিত্র নষ্ট হল, এইসব কথাই সবার মুখে। চঞ্চলদা বলল, একটা ফোনও যদি থানা থেকে করত, তাহলে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করা যেত। ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত যেতই না।"

"ফোন করেছিল কি করেনি, তাই বা কে জানে?" অসিত বলল।

জ্যোতিরও তাই মনে হয়েছিল খবরটা পড়েই। এই ধরনের ঘটনায় নামী অনেক ফুটবলার, ক্রিকেটাররা ধরা পড়েছিল বলে সে শুনেছে। কিন্তু কেস লেখার আগেই তাদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। অরবিন্দ মজুমদারের নাম আছে, সারথিও নামী ক্লাব, থানা থেকেই কেউ ফোন করে ক্লাবের চেনাশোনা কাউকে প্রথমে জানিয়ে দেবে। পুলিসের বড়কর্তাদের মধ্যেও সারথির সাপোর্টার আছে। তাদের একটা ফোনেই কাজ হয়ে যাবে। অরবিন্দদা তাদের কাউকে তো থানা থেকে ফোন করতে পারতেন।

"অরবিন্দদা নিজে ছাড়া আর কারুর পক্ষে তো এ বিষয়ে বলা সম্ভব নয়।

www.BanglaBook.org

তবে থানায় খোঁজ নিলেই ব্যাপারটা জানা যাবে, ফোন কাউকে করেছিল কিনা।" অসিত এই বলে, ঘড়ি দেখল।

"আমার এক বন্ধুর দাদা সার্জেন্ট, এখন বোধহয় পার্ক স্ট্রীট থানায়। ওকে একবার বলে দেখব, খোঁজ নিয়ে বলতে পারে কিনা।" বিষ্ণু বলল।

"অসিত তোর কি মনে হয়েছে অরবিন্দদা কাউকে ফোন করেছিল সাহায্য চেয়ে?"

"আমার ভাই কিছুই মনে হয় না। এই সব ক্লাব হল খচ্চরদের জায়গা। গরু যখন দুধ দেয় তখন তার চাঁট হাসিমুখে সইবে, দুধ আর দেবে না বুঝলেই কসাইখানায় বেচে দেবে। আগে আগে টাকা চাইলেই পেতুম, এখন শালারা আজ নয় কাল করছে। তোকে তো এসব ঝামেলা পোয়াতে হয়নি কখনো। চল্ ঢুকি এবার।" বিষ্ণুকে একটা ঠেলা দিয়ে বিরক্ত মুখে অসিত এগিয়ে গেল হলের দরজার দিকে।

জ্যোতি চেঁচিয়ে বলল, "প্র্যাকটিসে আসছিস তো?"

"না।"

অরবিন্দদার জীবনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ এদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। টাকার চিন্তাই অসিতের মন জুড়ে। সিনেমায় জ্যোতির মন বসল না। হাফ টাইমেই সে হল থেকে বেরিয়ে আসে।

ফেরার পথে তার মনে হল, অসিত বা তার মত প্লেয়ারদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। অরবিন্দদার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তেমনটি আর কারুর সঙ্গে হয়নি। অসিত চার বছর হল সারথিতে এসেছে অনেক ঘাটের জল খেয়ে। মুখে আঁটঘাট নেই। একদিন টেন্টে সে চেঁচিয়েই বলেছিল, "আমি গরীব ঘরের ছেলে, দারিদ্র্য কি জিনিস তা আমি জানি, লেখাপড়াও শিখিনি, শুধু ফুটবলটাই একটু খেলতে পারি তাই ভাঙ্গিয়েই ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছি আর দুটো পয়সার মুখ দেখছি। খেলা চিরকাল তো আর থাকবে না কাজেই যা পারি কুড়িয়ে বাড়িয়ে নেব। কোচ যেমন খেলতে বলবে তেমনি খেলব, ক্লাব যত ম্যাচ খেলতে বলবে তত ম্যাচই খেলব, শরীরে কুলোক আর নাই কুলোক কিন্তু টাকা আমি গুণে নেব, যা কথা হয়েছে তার থেকে একটা পয়সাও ছাড়ব না। গড়ের মাঠ জোচ্চরদের জায়গা, ভালমানুষী করেছ কি মরেছ। সব ক্লাবে শালা পকেটমার হারামীরা বসে আছে।"

বাইক চালাতে চালাতেই জ্যোতি আপনমনে হেসে ফেলেছিল। অসিতের কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশ শিক্ষিত বেকারে ভর্তি অথচ

লেখাপড়া জানে না। চাকরি কোনভাবেই অসিত পেত না যদি না ফুটবলটা খেলতে পারত। খেলা পড়ে আসছে এটা অসিত যতই বুঝতে পারছে ততই টাকার অর্থাৎ দর রাখার চিন্তা ওকে খেপিয়ে তুলছে। অরবিন্দদার জন্য ওর মনে বিশেষ কোন স্থান নেই। গড়ের মাঠে কেউই ওর আপন নয়। অরবিন্দদাও ওকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না, তার আপত্তি সত্ত্বেও অসিততে আনা হয়েছিল। এটা অসিত জানে।

"কই, বললি না তো, কেন অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করতে যাবি?"

জ্যোতির চট্‌কা ভাঙল। বিপিন স্যার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

"ওকে লজ্জা দেবার জন্য?"

"না, না, তা কি করে হয়।"

"তাহলে লজ্জা ভেঙে দেবার জন্য?"

জ্যোতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঠিক্। এই জন্যই সে যেতে চায়। একটা পাতলা হাসি তার মুখে সবে মাত্র ছড়াতে শুরু করেছে, বিপিন স্যার তখন ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, "ঊষার একটা চিঠি পেয়েছি, ওর বাবা ক্যান্সারে মারা গেছেন।"

হাসিটা ছড়িয়ে পড়ার মাঝপথে থেমে গিয়ে আবার ফিরে গেল ভেঙে পড়তে পড়তে। জ্যোতির কাঁধ দুটো সামান্য ঝুলে পড়ল। অস্ফুটে শুধু বলল, "ঊষা!"

"মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ওরা কয়েকদিন রেখে ছেড়ে দেন···বাড়ি গিয়ে মরার জন্য। মেয়ের কাছেই মারা গেছেন।"

"কোথায়? এখন ঊষা কোথায়?"

"আছে কোথাও···ভালই আছে মনে হয়। বিয়ে করেনি, করা উচিতও নয়। চাকরি করছে একটা গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, নার্সের চাকরি। লিখেছে, বদলি হতে চায় অন্য কোথাও। হেলথ ডিপার্টমেন্টে আমার এক ছাত্র আছে এটা ও জানে। তাকে ধরেই ওর চাকরিটা হয়েছিল। লিখেছে, যদি তাকে দিয়ে বদলি করাতে পারি। ও আর বাণীপুরে থাকতে চায় না।"

"বাণীপুরটা কোথায়?',

"পশ্চিমবঙ্গেই।" বিপিন স্যার কঠিন স্বরে বললেন, প্রায় বিদ্রূপের মত সেটা শোনাল।

"আমাকে ঠিকানাটা দেবেন?"

"কেন, কি দরকার? সেখানে গিয়ে ওর লজ্জা ভেঙে দেবে বলে?"

www.BanglaBook.org

জ্যোতি গুম হয়ে গেল। মাথার মধ্যে অপ্রকৃতিস্থ একটা ব্যাপার শুরু হয়েছে। বস্তুত সকাল থেকেই শুরু হয়ে এখন সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে ঠেলে তুলেছে।

লুকিয়ে থাকা একটা রাগ এবার তার মধ্যে ফেঁপে উঠতে লাগল। অসহায় করে দেওয়া এই সব ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে তার স্নায়ুমণ্ডলকে প্রহার করে করে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে যে রেহাই পাবার জন্য অন্ধের মত ঘোরাঘুরি করে একটা কানাগলির মধ্যে এবার সে ঢুকে পড়েছে। রাগ তাকে দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে ধাক্কা দিল। তার বোধ বিবেচনা অনুভব থেঁতলে গেল।

"আপনি আমার যা উপকার করেছেন, কোনদিনই তা অস্বীকার করব না—কিন্তু তাই বলে ব্যঙ্গ করছেন কেন? ভুল মানুষ মাত্রই করে।"

"কিন্তু মানুষ সে ভুল শোধরায় যদি সে মানুষ হয়।"

"আমার উপায় ছিল না।"

"ছিল। তুই ঊষাকে বিয়ে করতে পারতিস।"

"না। তাহলে আমার খেলার সর্বনাশ হয়ে যেত।"

"ঊষার থেকেও তোর খেলা বড়!"

"হ্যাঁ।"

বলেই জ্যোতি অবাক হয়ে গেল। শব্দটা তার মুখ থেকে বেরোল কি করে! বলার জন্য মোটেই তার অনুতাপ হচ্ছে না বরং এত সাহস যে তার মধ্যে রয়েছে এটাই তার জানা ছিল না!

"কি বললি! আবার বল্, আবার বল্।"

বিপিন স্যার উঠে দাঁড়িয়েছেন। দু পাশে তাকালেন। জ্যোতির মনে হল, উনি যেন বেত খুঁজছেন দুর্বিনীত ছাত্রকে সায়েস্তা করার জন্য।

"আমার খেলাই আমার সব কিছু, গোটা অস্তিত্ব। আমি মন-প্রাণ দিয়ে খেলায় যেতে চেয়েছি, খেলাকে শ্রদ্ধা করেছি। এদেশে বিরাট ঝুঁকি কিন্তু তবু চাকরি করিনি আজও। স্বার্থপর না হলে কোন কিছুতেই ঠেলে ওঠা যায় না। নিজেকে নিজেই তৈরি করে নিয়েছি, সেজন্য স্বার্থপরও হয়েছি অনেক ব্যাপারে। সবাই বলবে অন্যায় করেছি, বলুক তারা। মানুষকে আনন্দ দেওয়া আমার কাজ, এর একটা গুরুত্ব সমাজে আছে। সারথির হাজার হাজার সাপোর্টারকে আমি আনন্দ দিয়েছি, এর কি কোন মূল্য নেই?

"তখন বিয়ে করলে আমি আর উঠতে পারতাম না। বিশ্বাস করুন স্যার, তখন যে কি যন্ত্রণার মধ্যে আমি দিন কাটিয়েছি, রাত কাটিয়েছি। তখন আমার বয়স

মাত্র উনিশ। কিছু বুঝি না, জানি না। পাপ পুণ্যর কথা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। সেই প্রথম তখন আমি জিনিসটার মুখোমুখি হলাম। বয়স তখন উনিশ। কাউকে বলতে পারিনি, কেউ ছিল না আমার যাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারি—এবার আমি কি করব? একদিকে ঊষা আমার সত্যিকারের বন্ধু, আমার ভালবাসা আর একদিকে খেলা, বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ।

"স্যার, আমার অবস্থাটা তখন কি ছিল? আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি, ঠিক কথা। আমি পালিয়ে গিয়ে সারথির মেসে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কয়েক বছর এই অঞ্চলেই পা মাড়াইনি। হয়তো সেজন্যই, কৃতকর্মের দাম চোকাতে আমি দ্বিগুণ ভাবে খেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

"পাপবোধ কিনা জানি না, তবে অন্যায় করেছি, এটা সবসময় আমার মাথায় থেকে গেছে। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি ঊষার খোঁজ নিতে। সে বেঁচে আছে কিনা, বিয়ে করেছে কিনা, কিছুই আমি জানি না। ইচ্ছে করেই জানার চেষ্টা করিনি। হ্যাঁ, খেলা আমার কাছে ঊষার থেকেও বড় হয়ে উঠেছিল।

"স্যার, ঘর সংসার, ছেলে বৌ ফেলে রেখে কেউ যখন সন্ন্যাসী হবার জন্য নিরুদ্দেশ হয় তখন কি বলেন লোকটা নিষ্ঠুর, দায়িত্ববোধহীন, স্বার্থপর? বলেন না, কেননা সে বড় কাজ করার জন্য বৌ-ছেলেকে ফেলে বেরিয়ে গেছে, ভগবান পাবার জন্য তপস্যায় বসতে গেছে, জ্ঞানী হয়ে এসে মানুষকে উদ্ধার করবে বলে সংসার ছেড়েছে। আমি ভগবান-টগবান বুঝি না, বুঝি ওই হাওয়াভরা গোল জিনিসটাকে, ওটাই আমার ভগবান। আমার ভগবানের জন্য আমিও বেরিয়ে গেছি। আমাদের মধ্যে তাহলে তফাৎটা কোথায়? আমার সাধনার ফল দিয়ে আমি মানুষকে আনন্দ দিয়েছি, পার্থক্যটা কোথায়? আমি পাপী আর সে পুণ্যবান হবে কেন? গতর ভাঙ্গিয়ে আমার ভগবানের সেবা করি বলেই কি আমি নিকৃষ্ট আত্মার লোক, অপাংক্তেয়?"

জমে ওঠা অনেক কথা, যা বহুকাল বুকের মধ্যে দমবন্ধ করা অবস্থা তৈরি করে জ্যোতিকে বিস্ফোরণের পর্যায়ে নিয়ে গেছল, তারই সেফটি ভাল্‌ভ খুলে সে যেন কিছুটা বার করে দিল। চোখ দুটি বিস্ফারিত করে সে বিপিন স্যারের দিকে তাকিয়ে শক্ত করা মুঠো, শিরা ফুলে উঠেছে পুরো বাহুতে, ঠোঁটের কোণে ফেনা।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। দেখে মনে হয় দুজনেই গভীর কিছু ভাবছে, আসলে একদমই ভাবছে না। এত শূন্য হয়ে পড়েছে মানসিক ভাণ্ডার যে কথা বলার কোন উপাদানই ওদের কাছে এখন নেই।

www.BanglaBook.org

জ্যোতি উঠে দাঁড়াল। কথা না বলে দরজায় পৌঁছে একবার ঘুরে তাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, বিপিন স্যার ডাকলেন। জ্যোতি দাঁড়িয়ে পড়ল।

"এই নে ঊষার ঠিকানাটা।"

কাগজের টুকরোটা হাতে নিল জ্যোতি। সেটার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না।

"জ্যোতি, মানুষ নিজের মত করে ভগবান গড়ে নেয়। কারুর ভগবানই ছোট নয়। কিন্তু কথাটা হল, সন্ন্যাসীরা বা সাধকরা যে সাধনায় জ্ঞান অর্জন করেন তার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে উন্নত জীবনের পথ দেখাবার জন্য, সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য, স্থায়ী আনন্দ লাভ যাতে হয়, প্রেম প্রশান্তি যাতে পায়, তার জন্যই তারা কষ্ট করেন। উদ্দেশ্য শুভ তাই তারা শ্রদ্ধেয়, মাননীয়। তোমার সাধনার দ্বারা তুমি কি মানুষকে ভালবাসার পথে, মঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে পেরেছ? হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত বন্ধ করার নির্দেশ কি তোমার খেলা দিতে পেরেছ?

"আমি বলছি না তোমার ভগবান নিকৃষ্ট বা অপাংক্তেয়, কিন্তু যা শুধুই সাময়িক আনন্দের বস্তু তা কখনো গুরুত্ব পায় না মানুষের কাছে। এর শেষে আছে ক্লান্তি, অবসাদ, অতৃপ্তি।"

জ্যোতি অধৈর্য স্বরে বলে উঠল, "মাইক্রোফোনের সামনে এক লক্ষ বার শান্তির কথা বলার থেকে অনেক বেশি কাজ দেয় হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে, মাঠের মাঝে যদি একটা স্পোর্টশম্যানশিপ দেখান যায়। এই সবই তো ভাল কাজের প্রেরণা দেয়, সৎ হতে এগিয়ে দেয়, চরিত্র সবল করে। হেরে যাওয়ার পরও হাসিমুখে অপোনেন্টকে জড়িয়ে ধরা, রেফারীর ভুল ডিসিশনে ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেওয়া, এসবের প্রভাব খোল-কত্তাল বাজিয়ে কীর্তন করার থেকে কি কম কিছু?"

বিপিন স্যারের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সে তাকিয়ে রইল। তিনি চুপ করেই রইলেন। জ্যোতির উত্তেজনা তাতে কমল না।

"আপনি যদি মাঠে যান তাহলে দেখতে পাবেন।"

মোটরবাইকে স্টার্ট দেবার আগে সে তার হাতে-ধরা কাগজের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

॥ ছয় ॥

রোভার্স থেকে সারথি ফিরে আসে মফস্বলালের কাছে তিন-শূন্য গোলে হেরে। অরবিন্দ মজুমদারকে বাদ দিয়েই সারথি বোম্বাই গিয়েছিল। তিনি আর ক্লাবে একবারের জন্যও আসেন নি। একটা তিন লাইনের চিঠি ফুটবল সচিব চঞ্চল মৈত্রর কাছে তিনি পাঠিয়েছিলেন, তাতে শুধু লেখেন, ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে ক্লাবের ফুটবল কোচের কাজ চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি।

রোভার্সে যাওয়ার আগে ট্রেনিং করতে, কয়েকজন খেলোয়াড় মাত্র মাঠে এসেছিল। জ্যোতিও ছিল তাদের মধ্যে। অরবিন্দ মজুমদারের সহকারী রথীন চন্দ, চার বছর আগেও সে জ্যোতির সঙ্গে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলেছে। তাদের নিয়ে সে দৌড়, শুটিং ও পাসিং প্র্যাকটিস করায়। বয়স্ক প্লেয়াররা রথীনকে পাত্তা দেয় না, কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বও তার নেই। জুনিয়র ছেলেরা অবশ্য তাকে মান্য করে। ট্রেনিংয়ে প্রত্যেকেরই ছিল গাছাড়া ভাব। মাঠে এসেও দুজন প্র্যাকটিসে নামেনি, ইনজুরির অজুহাতে। জবেদ আর সত্যমূর্তি দেশে চলে গেছেন, ওরা বাড়ির থেকে বোম্বাইয়ে আসে শ্লথ, আনফিট অবস্থায়। বিষ্ণু কিছুটা সিরিয়াস হয়ে ট্রেনিং করেছিল। অসিত যা বলেছিল তাই করেছে, ট্রেনিংয়ে আসেনি। তবে বাড়িতে ওকে দু হাজার টাকা পৌঁছে দিয়ে আসায় প্লেনে বোম্বাই যায় এবং সবার থেকে ভাল খেলে।

জ্যোতি বুঝেই গিয়েছিল রোভার্স খেলতে বৃথাই যাওয়া। দলে আর বাঁধন নেই। পারস্পরিক ঈর্ষা থেকে যে আকচা আকচি তৈরি হয়েছে সেটাকে কাজে লাগাচ্ছে ক্লাবের কিছু মাতব্বর। খবরের কাগজে প্লেয়াররা, অফিসিয়ালরা নিয়মিত বিবৃতি, প্রতিবাদ আর অস্বীকৃতি জানানোর খেয়োখেয়ি শুরু করেছে। প্লেয়াররা তিন চারটে গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেছে। টাকার পেমেণ্ট প্রতিশ্রুতিমত না পাওয়ায়, ক্ষোভ বাড়তে বাড়তে ক্রমশ সন্দেহ এবং হতাশায় পৌঁছেছে। চোট থাকায় এবং ফর্মে না থাকায় কয়েকজন সিনিয়র প্লেয়ার দায়সারা ভাবে খেলে সারথিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

যে কোন সফল ফুটবল ক্লাবে একটা সময় আসেই যখন চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়তে হয়। কোন কিছুই সঠিক ভাবে চলে না। নতুন করে সব কিছু আবার গড়ে তুলতে হয়। এমন ব্যাপার, গড়ের মাঠে বারবার দেখা গেছে ইস্টবেঙ্গল,

www.BanglaBook.org

মোহনবাগান, মহমেডান বা যুগের যাত্রীর জীবনে। সারথি সংঘও ওঠা-পড়ার চক্রে এখন পড়তি ক্লাব।

অরবিন্দ মজুমদার ওটা বুঝতে পেরেছিলেন। গত সিজনের শুরুতেই তিনি কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ফুটবল কমিটির কাছে। টুর্নামেণ্ট খেলা, ট্রেনিং, রিক্রুট করা ও প্লেয়ার ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে তার একটি কথাও কমিটি মেনে নেয়নি। তারপর একদিন তিনি আলগোছেই জ্যোতিকে বলেছিলেন, 'আর আমার এখানে থাকার দরকার নেই।'

"সেকি! কেন?"

"আমি আর পারছি না, আর ভাল লাগছে না'

বুঝতে না পেরে জ্যোতি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"জ্যোতি তোরও কি আর আগের মত আনন্দ হয় মাঠে নেমে? নেহাত টাকা নিয়েছিস তাই ম্যাচের পর ম্যাচ খেলতে নামছিস, এরকম কি এখন মনে হয় না? অন্তরের ভেতর থেকে কি আর তাগিদ পাস?"

জ্যোতি চুপ করে ছিল। কিছুকাল ধরেই এক ধরনের ক্লান্তি মাঝে মাঝে তাকে হাঁফিয়ে তুলছে। ফুটবল ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠছে। যাদের সঙ্গে বা যাদের বিরুদ্ধে তাকে খেলতে হয়, তাদের স্কিল বা বৈচিত্র আর তার কাছে প্রতিবন্ধক বা চ্যালেঞ্জ হয়ে তাকে উত্তেজিত করায় না, তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার কাছে দাবী তোলে না। রুটিন মাফিক সে খেলে চলেছে। নিজেকে উন্নত করার দরকারটা তার কাছে এখন আর জরুরী ব্যাপার নয়।

"বদল ঘটা দরকার।"

"এই ফুটবল কাঠামোটার?" জ্যোতি কৌতূহল দেখাল।

অরবিন্দ মজুমদার হাসলেন, মাথা নাড়লেন। "আমাদের জীবন যাপন প্রণালীটার, যে ছকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি সেটা একঘেয়ে হয়ে গেছে। ফুটবল ছেড়ে অন্য কোন জীবনে যাওয়া দরকার। আসল কথা হল বেঁচে থাকা। কি ভাবে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছি, সেটা যথার্থই আমাকে জীবন্ত করে রাখছে কিনা—"

অরবিন্দ মজুমদার আর কথা বাড়াননি। এখন জ্যোতির মনে হচ্ছে, যে তীব্রতা, উদ্যম আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গড়ার যে ইচ্ছা এক সময় সে অরবিন্দদার মধ্যে দেখেছিল সেটা যেন ইদানীং ঝিমিয়ে পড়েছিল। ক্লাবে তাঁর বিরোধীরা ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখল করে নানান ভাবে তাঁর কাজে বাধা তৈরি

করছিল। টিম সিলেকশনে এক সময় তাঁর ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত কিন্তু তাঁর কব্জা থেকে এই অধিকারটা ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া হয়। ফুটবল সেক্রেটারির নির্দেশে এমন সব খেলোয়াড়দের দলে রাখতে শুরু করেন যাদের তিনি সারথির জার্সি গায়ে দেওয়ার যোগ্য বলে মনে করতেন না।

বোম্বাই থেকে ফেরার সময় ট্রেনে সে বিষ্ণুর কাছে শুনেছিল, মফৎলালের কোচ সাধন নাথকে সারথিতে আনা হবে অরবিন্দদার জায়গায়।

শুধু জ্যোতিই নয়, সারথির মালি থেকে র‍্যামপার্টের সাপোর্টার সবাই জানত অরবিন্দ মজুমদারকে আর রাখা হবে না। তার জায়গায় কাকে আনা হবে তাই নিয়ে কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছিল। পি. কে, অরুণ ঘোষ, অমল দত্ত—এইসব নামগুলি বক্সারদের ঘুঁষির মত ছোঁড়াছুড়ি হচ্ছিল।

জ্যোতিও কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। অরবিন্দ মজুমদারকে বাদ দিয়ে সারথিতে সে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে রাখবে, তার ফুটবল জীবনে এর প্রতিক্রিয়া কতখানি ঘটবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছিল না। প্রতিটি ব্যাপারে অরবিন্দ তাকে সাহস, প্রেরণা এবং সুযোগ, অনেকের মতে 'লাই' দিয়ে গেছেন। দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা প্রায় বাপ-ছেলের মত হয়ে উঠেছিল। জ্যোতির নিজের সম্পর্কে প্রত্যয়টা বেড়ে উঠেছিল অরবিন্দরই প্রভাবে।

সারথিতে প্রথম ম্যাচ খেলার কথা সে জীবনে ভুলবে না। আটটা লীগ খেলায় তাকে ড্রেস করিয়ে সাইড বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন অরবিন্দ মজুমদার। জ্যোতি বিরক্ত, হতাশ হয়ে উঠছিল। গত বছর অবনমন থেকে কোনক্রমে রক্ষা পাওয়া অরুণোদয়ের সঙ্গে গোলশূন্য খেলার পর সারথি প্রবলভাবে পাঁচ গোলে বান্ধব সমিতিকে হারায়।

দুদিন পর জ্যোতি টেন্টে অরবিন্দর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল কেউ নেই।

"একটা কথা বলব?"

"কি ব্যাপার, কি বলবে?"

সরাসরি জ্যোতি প্রসঙ্গে এল। "এবার আমি মাঠে নামতে চাই।"

ঝাঁকুনি দিয়ে অরবিন্দ সিধে হয়ে বসলেন অবাক চোখে। ছেলেটির সাহসে নয়, স্পর্ধায় তিনি বিস্মিত। হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জ্যোতির চোখমুখের ভাব দেখে নিজেকে সংযত করলেন।

"খেলতে চাও? ভাল, এরকম অ্যাম্বিশনই দরকার।"

"পরের ম্যাচেই নামতে চাই, যদি টিমে জায়গা থাকে।"

www.BanglaBook.org

"বসো।" গম্ভীর গলায় অরবিন্দ বললেন। "সোজাসুজিই কথা বলা ভাল। তুমি মনে করছ যে ফার্স্ট ইলেভেনে খেলার উপযুক্ত?"

"হ্যাঁ।"

"বয়স কত?"

"উনিশ ছাড়াব এই জুলাইয়ে।"

"সারথিতে সবে এসেছ, এখনো পুরো সিজনও কাটেনি। এর মধ্যেই ফার্স্ট টিমে আসতে চাও?" অরবিন্দ সামান্য ধমকের ভঙ্গি স্বরে আনলেও, ছেলেটির নার্ভের তারিফ করলেন মনে মনে।

"রিজার্ভে তুমি একা নও, আরো চারজন আছে যারা গত বছর থেকে রয়েছে।"

"থাকতে পারে। যোগ্যতা না থাকলে অনন্তকাল রিজার্ভে থাকবে কিংবা অন্য ক্লাবে চলে যাবে। কিন্তু আমি ওদের স্ট্যাণ্ডার্ডের নই, এটা আমি জানি।"

জ্যোতির মনে হল, বোধহয় অহঙ্কার দেখাল। কিন্তু নিজেকে হামবড়াই করে তুলে ধরার জন্য সে কোচের কাছে আসেনি। তাকে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাতেই তার আসা।

"একটা কথা জেনে রাখ, বলা কওয়া করে বা কাউকে দিয়ে পুশ করিয়ে আমার টিমে আসা যায় না। যখন নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে তখন সিলেক্টেড হবে। বুঝেছ?"

"হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম যদি একটা সুযোগ…"

"সুযোগ তখনই পাবে যখন আমি মনে করব তুমি তৈরি হয়েছ। ইতিমধ্যে যা ট্রেনিং করে যাচ্ছ করে যাও। এখনো তোমার সামনে বারো-চোদ্দ বছর পড়ে আছে। এত ব্যস্ত হবার কি? কতদিন বাড়ি যাওনি?

"মেসে আসার পর আর যাইনি।"

"বিপিন গোস্বামী আমাকে চিঠি দিয়েছে, তুমি কেমন করছ-টরছ তাই জানতে। লিখেছি ভালই করছে।"

অরবিন্দ টেবলের কয়েকটা চিঠি তুলে নিয়ে তাতে মনযোগ দিলেন। কথাবার্তা শেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

"বেশ।" জ্যোতি হাসিমুখে বলল।

"মনে রেখ, মেনি আর কল্ড, ফিউ আর চোসন্।"

জ্যোতি চলে যাবার পর অরবিন্দর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। ফুটবলারদের

জীবন গড়ে তোলায় ভাগ্যের হাত থাকেই। পর পর কয়েকটা চোট আর রেড কার্ড, চারজনকে প্রথম টিম থেকে সরিয়ে দিতেই জ্যোতির সুযোগ এল।

"মনে কোর না তুমি পাকাপাকি টিমে এলে। সেরে উঠে ওরা ফিরে এলেই আবার সাইড বেঞ্চে বসতে হবে।" অরবিন্দ জল ঢেলে দিয়েছিলেন জ্যোতির টগবগে উৎসাহে। কিন্তু যেটা তিনি বলেননি কিন্তু বলার ইচ্ছা ছিল—এমনভাবে নিজেকে প্রমাণ কর যেন দল থেকে তোমাকে বাদ দেওয়া না যায়, এমনকি পুরো দল ফিট থাকলেও।

অরবিন্দ মজুমদার পঁয়ত্রিশ বছর গড়ের মাঠে ঘোরাফেরা করছেন। প্রতিভা চিনে নিতে তাঁর বেশি সময় লাগে না। তিনি বোঝেন জ্যোতিকে খুব সাবধানে গড়ে তোলা দরকার, বেশি চাপের মধ্যে ঠেলে দিলে পঙ্গু হয়ে যাবে। ওর পিছনে ডায়নামো লাগিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করাতেও তাঁর সায় নেই। স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দ্রুতবেগে বৃদ্ধি ঘটাতে গেলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। এরকম তিনি অনেক দেখেছেন, প্রতিশ্রুতিবান ছেলেরা কুড়ি পার হতে না হতেই জ্বলে শেষ হয়ে গেছে, ক্ষমতার অতিরিক্ত নিজেদের ঠেলে তুলতে গিয়ে।

"নিজের যা খেলা তাই খেলবি। হাঁকপাক করে খেলবি না।" কথাগুলো মাঠে নামার সময় অরবিন্দ তাকে বলেছিলেন। "দমদম একতাকে হারান কঠিন কাজ। টাফ ডিফেন্সের এগেনস্টে তোকে খেলতে হবে। বল থেকে যতটা পারবি দূরে ফাঁকায় থাকবি, বাচ্চু তোকে ফীড করাবে। আবার বলছি হাঁকপাক নয়, নিজের খেলাটা খেলে যাবি···আর কিছু আমার বলার নেই।"

অরবিন্দর কথাগুলো কতটা তার মাথায় ঢুকেছিল সে জানে না তবে একটা ব্যাপার আজও মনে আছে—অরবিন্দদা সেদিন 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে নেমেছিলেন। এটাই সেদিন তাকে একটা গভীর সুখে ভরিয়ে মাঠে নামিয়েছিল।

তখন প্রধান স্ট্রাইকার ছিল শৈবাল। আগের বছর সে গোড়ালিতে চোট পেয়ে বসে গেছল। ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরে এসেছে। ওর খেলাটা দ্রুত এবং কঠিন, ডিফেন্স চেরা থ্রু পাশ দেয় পরিচ্ছন্নভাবে, আর চমৎকার হেড করে। সারথি থেকে মোহনবাগান হয়ে শৈবাল এখন খেলছে যুগের যাত্রীতে। তার পাশে সেদিন জ্যোতির নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। কিক অফ থেকে শৈবাল বলটা প্রথম পরশের জন্য জ্যোতিকে দিল। সে হাফ ব্যাককে ব্যাকহিল করেই সামনে ছুটে গেল।

একতার সমর্থকদের উল্লসিত চিৎকারে সে পিছনে তাকিয়ে দেখল একতার

www.BanglaBook.org

খেলোয়াড়রা তাদের একজনকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে আর গোল থেকে বল বার করে আনছে গৌতম।

শুরুতেই গোল খেয়ে জ্যোতি দমে গেল। শৈবাল অশ্রাব্য কয়েকটা গালি দিল নিজেদের গোলকিপারকে। কিক অফ থেকে আবার সে বল দিল জ্যোতিকে। এবার সে ব্যাকহিল করার ভাণ করে বলটা ডান পায়ে থামিয়ে পায়ের পাতা দিয়ে ইনসাইড লেফটকে দিল। সে বল ধরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ায়, দখলে রাখতে পারল না কিন্তু পা চালিয়ে বলটাকে বাঁদিকে জবেদের কাছে পাঠিয়ে দিল। জবেদ দোনামনা করল। টাচলাইন ধরে সোজা দৌড়বে না তুলে গোলমুখে ফেলবে সেটা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। অবশেষে গোলের সামনে ফেলল। বলটার জন্য কয়েকটা পা এলোপাতাড়ি চলল। শেষে একজনের বুটের ডগা থেকে এল জ্যোতির কাছে।

বলটা আবার গোলমুখে পাঠিয়ে কিছু একটা প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে পারে অথবা ডানদিকে সরে গিয়ে গোলে শট নিতে পারে—কোন্‌টা করবে? কোণাচে ভাবে ডানদিকে সরে গেল জ্যোতি। সারথির জার্সিগুলো প্রত্যাশিত ক্রসের জন্য জায়গা নিয়ে দাঁড়াল আর একতার জার্সিগুলো তাদের সামনে ও পিছনে এসে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দুই দলের জটলা আর একতা গোলকিপার একই লাইনে জ্যোতির সামনে। সে উঁচু করে আলতো শটে বলটাকে মাথাগুলোর উপর দিয়ে ফেলল এবং ক্রসবার ঘেঁষে সেটা গোলে ঢুকল। একতার গোলকিপার শুধু ফ্যালফ্যাল চোখে বলটার দিকে তাকিয়ে রইল।

জ্যোতিও অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে থেকেছিল। গোল? হতে পারে না! মুখ ফিরিয়ে রেফারির দিকে তাকাল। নিশ্চয় কারুর অফসাইড কিংবা কারুর ফাউল হয়েছে আর ফ্রি কিক নেবার জন্য রেফারি আঙুল দেখাচ্ছে জায়গাটার দিকে। এই ভেবেই সে তাকিয়েছিল এবং দেখল রেফারি সেন্টারের দিকে হাত দেখাচ্ছে। তা হলে গোল! গ্যালারিতে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে।

সারথির প্রথম টিমে খেলতে নেমে তিন মিনিটেই জ্যোতি গোল করে। এরপর খেলাটা আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ, অল্পের জন্য সুযোগ নষ্ট, গোলমুখে জটলা, অফসাইড এবং দীর্ঘ সময় ধরে মাঝ মাঠে আটকে থেকে অবশেষে এক-এক অমীমাংসিত থাকে।

পরদিন প্রত্যেকটি কাগজে তার ছবি বেরোয়। ম্যাচের প্রত্যেক রিপোর্টেই রেখে-ঢেকে, সতর্কভাবে, মোটামুটি একটি ধারণা, বিভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গিতে বলা হয়েছে—নতুন একটি তারকার উদয় হতে চলেছে।

পরের ম্যাচ হাওড়া ফ্রেণ্ডসের সঙ্গে। প্রথমার্ধেই সারথি দু গোলে পিছিয়ে গেল। অরবিন্দ মজুমদার বিরতির সময় কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ বা কাকে কি করতে হবে বলা পছন্দ করেন না। নাটুকে বক্তৃতা করে আবেগের তোড়ে ভাসিয়ে দেওয়া কি চিৎকার করে গালিগালাজ, তার রণকৌশলের অন্তর্গত নয়। খেলোয়াড়রা শান্তিতে জিরোক, এটাই তিনি চান।

"এবার চার-তিন-তিন ফর্মেশন নিয়ে আর আমরা খেলব না। এবার অল-আউট অ্যাটাক। হারলে লড়ে হারব। মনে হচ্ছে, ওরা ধরেই নিয়েছে আমাদের হাঁটুতে জং ধরে গেছে, ঘুরে দাঁড়াবার ক্ষমতা আর নেই। কিন্তু এবার আমরা ওদের হাঁটু খুলে নেব, কয়েকটা গোল ওদের গেলাব। টু-থ্রি-ফাইভ—পুরনো আমলের ছকে এবার আবার আমরা খেলব। কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে?

কেউ কোন জিজ্ঞাসা তোলেনি। পঞ্চান্ন আর আটান্ন মিনিটে শৈবাল দুটো গোল দেয়, আটষট্টি মিনিটে জ্যোতির গোলে সারথি ম্যাচ জেতে। দু ঘণ্টা পর, স্নান সেরে যখন সে তাঁবু থেকে বেরোচ্ছিল তখন অরবিন্দদা তাকে ডেকে পাঠান।

"জ্যোতি তোর গায়ের মাপটা দিস তো। তোর বৌদি ভাল সোয়েটার বোনে।"

"এই গ্রীষ্মে সোয়েটার কি করব!"

"আহা, বোনা শেষ হতে হতে শীত এসে যাবে। নড়াচড়া তো নেই, বসে বসেই যতটা কাজ-টাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে আর কি…তুই বরং নিজে গিয়ে মাপ দিয়ে আসিস।"

এই অরবিন্দ মজুমদারের জায়গায় আসবে সাধন নাথ। লোকটি সম্পর্কে জ্যোতি বিশেষ কিছু জানে না। কলকাতায় ছোট কয়েকটা ক্লাবে কোচ করেছিল এন আই এস থেকে ফিরে। ক্লাবগুলোর কোন উন্নতি হয়নি বরং একটি নেমে যায় দ্বিতীয় ডিভিসনে। তারপর এক বছর হাতে কোন ক্লাব পায়নি। একদিন হঠাৎই চাকরি নিয়ে সাধন নাথ ভিলাই স্টিলের ফুটবল কোচ হয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। তারপর কলকাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না, শুধু টিম নিয়ে আই এফ এ শীল্ডে খেলতে আসা ছাড়া।

সাধন ভিলাই ছেড়ে কবে বোম্বাইয়ে গেছে কেউ সে খবর রাখেনি। টাটা স্পোর্টস থেকে মফস্বলে গিয়ে দু বছর তাদের হারউড লিগ চ্যাম্পিয়ন করার পর সাধন ভারতীয় ফুটবল দলের কাজাকিস্তান সফরে কোচ হয়েছিল। জ্যোতি ও

www.BanglaBook.org

শৈবাল নির্বাচিত হয়েছিল কিন্তু জ্যোতি যেতে পারেনি। ম্যালেরিয়া তাকে ভারত দলে প্রথমবার খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল।

সফর থেকে ফিরে আসার পর শৈবালের মুখে সে সাধন নাথের প্রশংসা শুনেছে। "খুব স্ট্রিক্ট, ডিসিপ্লিনের দিকে কড়া নজর। আর দারুণ জ্ঞান ট্যাকটিকস সম্পর্কে।"

মাঠে সে সাধন নাথকে দেখেছে, অন্তত সাত-আটবার, কিন্তু কখনো মুখে হাসি দেখেনি। বোধহয় হাসলে লোকে উৎসাহিত হবে অন্তরঙ্গতার, তাই তাদের দূরে রাখার জন্য গোমড়ামুখো। একবার জ্যোতিকে মফস্বলের এক বাঙালী-খেলোয়াড় বলেছিল, "সাধন নাথের সঙ্গে কোনদিন কারুর ঘনিষ্ঠতা দেখিনি। প্রেম করে নাকি বিয়ে করেছে, কি করে যে বৌকে প্রোপোজ করল…আরো অবাক কাণ্ড দুটো মেয়েও হয়েছে, একেই বলে দৈবের হাত!"

ট্রেনেই জ্যোতি জিজ্ঞাসা করেছিল বিষ্ণুকে, "সাধন নাথকে সারথিতে আসার জন্য কে কথাবার্তা বলল?"

"চঞ্চলদাই বোধহয়। হোটেলে একদিন ওর ঘরে সাধন নাথকে দেখেছি।"

জ্যোতি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কলকাতার কাছাকাছি ট্রেন এলে সে চঞ্চল মৈত্রকে একা পেয়ে জানতে চায় কথাটা সত্যি কিনা এবং নির্বাচনটা কে করেছে? বরাবর অরবিন্দ মজুমদারের আওতায় সে থেকেছে। অঙ্কুর থেকে মহীরুহ হয়ে উঠতে যে অবাধ রোদ বাতাস জল দরকার, অরবিন্দ তাকে তা যুগিয়েছে। মাঠে তার খেলার স্বাধীনতায় কখনো রাশ পরাননি। এখন নতুন কোচ তাকে কি ভাবে ব্যবহার করবে, তাকে তার মত খেলতে দেবে কিনা, এই নিয়ে সে উদ্বেগ বোধ করতে শুরু করেছে।

"সাধনকে আনার কথা তো অনেক দিন ধরেই ভাবা হচ্ছিল।"

"অনেক দিন! কত দিন?"

"সিজনের গোড়া থেকেই।…অরবিন্দকে দিয়ে আর চলে না, মানছি লোকটা সারথির জন্য অনেক করেছে, টিমটা দাঁড় করিয়েছে, অনেক ট্রফি এনে দিয়েছে। কিন্তু গত দু বছর ধরে আর পারছিল না। চিরকাল মানুষ সফল হতে পারে না। একটা সময় আসে যখন সাফল্যগুলোই বোঝার মত কাঁধে চেপে বসে। বিপর্যয় ঘটার সময় তখনই আসে। তখনই সেট-ব্যাক হতে শুরু করে, যা সারথির এখন হয়েছে।

"ওর যা দেবার দিয়েছে। কলকাতার কটা কোচ পেরেছে যা অরবিন্দ পেরেছে? কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা ক্লাব তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে

পারে না। ও সব পুরনো বনেদী বড়লোকের বাড়িতে চলে। কবে ঘি খেয়েছি আজও হাতে তার গন্ধ শুঁকিয়ে বেড়ান, দেখছিস না মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অবস্থা!"

"ওকে আনাটা কে ঠিক করল?"

"অনেকেই চাইছে। সন্তোষদা, কিরণ ওরা তো গত বছরই বলেছিল, প্লেয়াররা সব মাথায় চড়ে বসছে অরবিন্দর আস্কারায়, পেমেন্ট নিয়ে ঝগড়া করছে, খেলব না বলে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করছে, ছোটলোকের মত ব্যবহার করছে ক্লাবের সঙ্গে।"

"কিন্তু চঞ্চলদা, প্লেয়ারদের সঙ্গে যা কথা হয়েছিল, যে ভাবে কিস্তিতে টাকা দেবার কথা, তা যদি না দেওয়া হয়, আজ নয় কাল বলে যদি ঘোরানো হয়, তা হলে তো ওরা খেপে যাবেই। গত বছর পুলক যাত্রীতে চলে গেল। ও নাকি সারথির কাছ থেকে এখনো আট হাজার টাকা পায়।"

"মিথ্যে কথা। তুই আসিস, তোকে খাতা দেখাব, ওর সই দেখাব। কড়ায় গণ্ডায় সব টাকা নিয়ে গেছে। এমন কি মায়ের গলব্লাডার অপারেশন হবে বলে পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স চেয়ে পায়ে ধারধরি করেছিল, দিয়েছি। সেই টাকা কেটে রেখে ওর সব প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়েছি। আর এখন বলে বেড়াচ্ছে সারথি টাকা মেরেছে, নেমকহারাম···সব নেমকহারাম। থাকত তো হাওড়ার অজ গাঁয়ে একটা ভাঙা কুঁড়েঘরে, দেখেছি তো। সেখান থেকে তুলে এনেছিলাম। আর আজ কিনা···"আচ্ছা জ্যোতি এত বছর তো তুই আছিস, কোনদিন কি তোর একটা পয়সা বাকি ফেলেছি? বল, বল?"

জ্যোতি মাথা নাড়ল। সে জানে তার পাওনা টাকা বাকি থাকলে অরবিন্দদার জিভের চাবুকে প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি জর্জরিত হবে। 'ভক্ত'রা যদি জানতে পারে তা হলে কমিটি সদস্যদের মোটর গাড়িগুলোর কাচ আস্ত থাকবে না। সব থেকে বড় কথা, জ্যোতি বিশ্বাসকে অখুশি রাখাটা বিপদ ডেকে আনবে। প্রতি বছরই ট্রান্সফারের আগে জল্পনা হয় জ্যোতিকে নিয়ে, ক্লাব কত টাকার অফার নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে তাই নিয়ে ময়দানে কানাঘুষো শুরু হয় এবং সে উইথড্র না করা পর্যন্ত সারথির সাপোর্টাররা যন্ত্রণায় দিন কাটায়।

"চঞ্চলদা, তা হলে আপনারা ঠিক করেই ফেলেছিলেন অরবিন্দদাকে সরাবেন?"

"আহ্ হা, সরাব বললেই কি ওকে সরান যায়? ওর কত সাপোর্টার ক্লাবে আর ক্লাবের বাইরে আছে তা জানিস? সরোজদা ওকে এনেছিলেন, আমিই তো গিয়ে

www.BanglaBook.org

কথাবার্তা বলেছিলাম। ক্লাবে সরোজদার প্রভাব প্রতিপত্তি তখন তুঙ্গে। যা বলে তাই হয়। খরচও করত দু হাতে, মেজাজও ছিল নবাবের মতো। তোর মোটর-বাইকটার কথাই মনে কর না, পেলি কি করে?···তারপর কি যে শনির দৃষ্টি ওর ওপর পড়ল, শেয়ার বাজারে একেবারে ভিখিরি হয়ে গেল। কিন্তু ছাখ, সেজন্য সারথি সঙ্ঘ কি ধুলোয় লুটোল না ক্লাব উঠে গেল? একটু তখন অসুবিধে হল বটে কিন্তু আবার নতুন লোক এসে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। একটা-দুটো লোক কি প্লেয়ারের ভরসায় বড় বড় ক্লাব তো চলে না, চলে নিজের জোরে। নামের ভারেই কেটে যায়।"

"প্রথম প্রথম একটু খিচখিচ করে, তখন একটু ঝাড়পোছ, এখানে ওখানে গ্রীজ আর মোবিল, নাট বল্টুগুলো একটু টাইট, তারপর চাকা যেমন ঘুরছিল তেমনিই ঘুরবে। বড় বড় কোম্পানিতে, কত ম্যানেজার, কন্ট্রোলার, ডিরেক্টর ছেড়ে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, তাই বলে কি কোম্পানি উঠে যাচ্ছে?

"অরবিন্দদাকে আগেই সরালেন না কেন? তা যদি করতেন তা হলে এই যে ঘটনা ওকে নিয়ে ঘটল, তার ফলে সারথির গায়ে কালি লাগত না।"

"কে বলেছে লেগেছে! এত বড় ক্লাবের গায়ে কালি কি অত সহজে লাগে? খোঁজ নিয়ে ছাখ লোকে সব ভুলে গেছে। এইটেই তো বড় ভরসা, সাপোর্টারদের স্মৃতি। সারথিতে সরোজদার কম অবদান! কিন্তু ছাখ, একজনও আর ওকে মনে রাখেনি। দু হপ্তা, তিন হপ্তা, বড়জোর এক মাস···ব্যাস। তারপর একটা ট্রফি জিতলেই সব স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ।"

"আমাকে তো সবাই 'অরবিন্দর ছেলে' বলে জানে।" জ্যোতি মুচকি হেসে বলল, "অরবিন্দদা না থাকলে আমার তো কোন প্রোটেকশন ক্লাবে থাকবে না।"

"তোর প্রোটেকশন!" চঞ্চল মৈত্র এমন ভয়ঙ্কর রকমের অবাক কথা যেন এই প্রথম শুনল। "বলিস কি? ক্লাব তো তোরই প্রোটেকশনে রয়েছে!"

"কোন ট্রফি এ বছর জেতা হয়নি, লিগে ফোর্থ। সাপোর্টারদের বিখ্যাত বা কুখ্যাত স্মৃতি থেকে ধুয়ে মুছে যাবার সময় তো ঘনিয়ে এল।"

"ঠাট্টা করছিস। আমি যতদিন ক্লাবে আছি তোকে কোন চিন্তা করতে হবে না। ক'বছর আর খেললি যে এইসব চিন্তা শুরু করেছিস? ছাখ পি কে, চুনী, অরুণ কত বছর ফর্ম নিয়ে খেলে গেছে, হাবিব, শ্যাম এখনো খেলে যাচ্ছে আর তোর তো দশটা বছরও এখনো হল না। এখনো তুই সারথির সারথি!"

"কিন্তু একটা কথার উত্তর পেলাম না, অরবিন্দদাকে আগেই কেন ছাঁটাই করা

হয়নি ?" জ্যোতি স্বরটাকে তীক্ষ্ণ, কঠিন করায়, চঞ্চলের খোসমেজাজী খোলসটা খসে পড়ল।

"অসুবিধে ছিল। তা হলে কাকে কোচ করা যেত ? কেউ নেই। কলকাতার কাউকে রাখা হবে না সেটা ঠিক করাই হয়েছিল। তা ছাড়া অরবিন্দকে সরাবার মত কোন কারণ বা যুক্তিও তেমন জোরাল ছিল না। মেম্বারদের ফেস করতে হবে, কি বলা যেত ?"

"যদি অরবিন্দদার এই ব্যাপারটা না ঘটতো তা হলে কি করতেন ?"

"কি আর করা যেত, কিছুই না। ওকে ক্লাব ছাড়ার জন্য তো বলা হয়েছিল।"

"সে কি ! কই আমি তো শুনিনি এটা ?" জ্যোতি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

"দাশুই ওকে বলেছিল। খুব ধুমধাম করে সংবর্ধনা দিয়ে ফেয়ারওয়েল আর চাঁদা তুলে হাজার তিরিশ-চল্লিশ টাকার একটা চেক দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এসব কথা দাশু বা অরবিন্দ কেউই কি তোকে বলেনি ?"

"না।"

চঞ্চলকে অপ্রতিভ দেখাল। কথাগুলো বলে ফেলাটা ঠিক হল কিনা বুঝতে পারছে না। তবে নতুন কোচ যখন এসে যাচ্ছেই তখন এসব কথা প্রকাশ হলে কিই বা আসে যায়।

"অরবিন্দদা কি বলেছিল ?"

"তা তো আমি জানি না। তোর তো দাশুর সঙ্গে খুব ভাব, ওকেই জিজ্ঞেস করে নিস।"

জ্যোতির ক্ষোভ যতটা হচ্ছে ততটাই অভিমান। এই দু'জন লোকের এত কাছের মানুষ সে অথচ কেউই তাকে কিছু বলেনি। গুম হয়ে সে উঠে গিয়ে নিজের জায়গায় বসল। ট্রেন খড়্গপুর স্টেশনে তখন ঢুকছে।

॥ সাত ॥

মেসে নিজের ঘরে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা খাম নিয়ে এল সূর্য। ডাকে এসেছে।

"আর আসেনি ?"

"না, একটাই। চা দেব ?"

www.BanglaBook.org

"না।"

মাত্র একটা চিঠি ! তিন-চারমাস ধরে চিঠির সংখ্যা কমে আসছে। জ্যোতির খারাপ লাগে ভক্তদের চিঠি না পেলে। অধিকাংশই বালক বা কিশোরদের লেখা। উচ্ছ্বাস, স্তুতি আর ট্রফি জেতার জন্য মিনতি, কখনো বা দাবী। এগুলো প্রথম দিকে পড়তে জ্যোতির ভালই লাগত। কিছু কিছু জমিয়ে রেখেছিল। পরে আর সে চিঠিগুলো পড়ত না, চোখ বুলিয়েই ফেলে দিত।

সই করা ফোটো চেয়ে চিঠি আসত। এক ফোটোগ্রাফার জ্যোতিকে তার দুটো ছবির নেগেটিভ দিয়েছিল। গোল দিয়ে দুহাত তুলে রয়েছে আর বিছানায় পাজামা পরা বালিশে হেলান দেওয়া—এই দুটির কয়েকশো প্রিন্ট করিয়ে রেখেছিল। দুমাসেই সেগুলো শেষ হয়ে যায়। তারপর আবার প্রিন্ট করায় এবং চিঠির বয়ান আর গুরুত্ব বুঝে এরপর সে ছবি উপহার দিত।

কিছু চিঠি আসত বয়স্কদের কাছ থেকে। প্রশংসা অথবা সমালোচনা এবং উপদেশে ভরা সেই সব চিঠি। সে খুঁটিয়েই পড়ত। কিভাবে শরীরের যত্ন নিতে হবে, ত্রিফলার জল খায় কিনা, ঘানির সর্ষের তেল মাখে কিনা থেকে শুরু করে টাকা কি ভাবে জমাতে হয়, জাতীয় সার্টিফিকেট কিনতে হলে কোন্ পোস্ট অফিসে কার সঙ্গে দেখা করতে হবে তাও বলা থাকত। সে সাঁই বাবার ভক্ত কিনা, স্বামী বিবেকানন্দর লেখা পড়েছে কিনা ইত্যাদি ছাড়াও একজন তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল, মেয়ের ছবিসহ। তাই নিয়ে মেসে হাসাহাসি পড়ে গিয়েছিল। "চল্ মেয়ে দেখে আসি, এক প্লেট খাবার তো পাওয়া যাবে," গৌতম এই বলে জনাচারেককে রাজি করিয়েও ফেলেছিল।

চিঠি আসত মেয়েদের কাছ থেকেও। সাধারণ অভিনন্দন থেকে শুরু করে গদগদ আবেগভরা উচ্ছ্বাস, যাকে অনায়াসেই প্রেম নিবেদন বলা যায়। জ্যোতির লোভ হত এদের সঙ্গে আলাপ করতে, ঘনিষ্ঠ হতে। কোন কোন মেয়ে পরিষ্কারই লিখেছিল তারা জ্যোতির সঙ্গে শুতে চায়। নিজেকে দমন করতে না পেরে একজনকে সে উত্তরও দিয়েছিল।

কালো কাচের চশমা পরে জ্যোতি অপেক্ষা করেছিল পার্ক স্ট্রিটে মুলাঁ রুজ-এ। জীন্স পরা, ঢোলা ব্লাউজ ছেলেদের মত ছাঁটা চুল, লম্বা, রুগ্ন একটি মেয়ে, চিঠির নির্দেশ মত যথাসময়ে তার টেবলে এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখেই জ্যোতি ঢোঁক গিলেছিল। মেয়েটি ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, ঝরঝরে ইংরাজী বলে, বাবা বেলেঘেটে বড় অফিসার। কিছুক্ষণ গল্প করে, বীয়ার ও তন্দুরি চিকেন খেয়ে,

দরকারী কাজ আছে আবার পরে দেখা হবে বলে জ্যোতি উঠে পড়ে। ট্যাক্সি ডেকে অনিচ্ছুক মেয়েটিকে তাতে তুলে দিয়ে এবং ভাড়ার জন্য কুড়ি টাকার একটি নোট জোর করে তার হাতে ধরিয়ে দেয়।

"খবরদার জ্যোতি, এরকম অনেক চিঠি পাবি, অনেকে কাছে আসবেও, একদমই পাত্তা দিবি না, কোনও ভাবে ইনভলভড হবি না, তাহলে ফেঁসে যাবি। অনেক দেখেছি এরকম।" দাশুদা সাবধান করে দিয়েছিল। তারপরই গৌরীর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেয়।

সারথির সাফল্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিও কমে গেছে। তার নিজের খেলার টানে যে চিঠিগুলো আসত, তারও সংখ্যা কমতে কমতে সপ্তাহে একটি-দুটিতে ঠেকেছে।

এসব কিসের লক্ষণ? তার খেলা কি পড়ে আসছে? জ্যোতির বুক থেকে শীতল একটা ঝাপটা শিরা উপশিরা দিয়ে চুল এবং নখ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। জনপ্রিয়তা কমে আসছে? সারথি আর জিতছে না, আর সে জেতাতে পারছে না।

ফুটবল একার খেলা নয়, বাকি দশজনকে নিয়ে মালার মত যদি গাঁথা না হয় তাহলে দল কখনো গতি পায় না, ছন্দে ওঠানামা করে না। মালা গাঁথার কাজ ছিল অরবিন্দদার। সে কাজ তিনি আর করতেন না। জ্যোতিই খেলে জিতিয়ে দেবে। আর সবার মত শেষ দিকে তিনিও এই ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ফুটবল তো একার খেলা নয়।

ডানবাহু দিয়ে চোখ ঢেকে সে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। তার কিছুই আর এখন ভাল লাগছে না। আর খেলতে পারছে না, এমন ভয়ঙ্কর দিনের কথা আজ পর্যন্ত কখনো তার মনে উঁকি দেয়নি। সে জানে, সব ফুটবলারই জানে, একদিন মাঠ থেকে রিটায়ার করতেই হবে। কিন্তু এখনই কেন, মনের মধ্যে এসব অমঙ্গলে ভাবনা ঢুকছে! এখনো সে ইচ্ছে করলে ভারতের যে কোন ডিফেন্সকে তছনছ করে দিতে পারে।

সত্যি কি পারে? জ্যোতির চোখে ভীত চাহনি ফুটে উঠল। কই রোভার্সে তো পারল না। যুগের যাত্রী, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সঙ্গে লীগের খেলায়, আই এফ এ শীল্ডে এরিয়ানের সঙ্গে, বরদলুইয়ে, ডুরাণ্ডে কোথাও তো সে সারথিকে জেতাতে পারেনি! তছনছ করার ক্ষমতা একসময় ছিল···তাহলে কি অতীতের সাফল্যের মধ্যে সে বাস করছে? এটা তো পড়ে যাওয়ার লক্ষণ!

www.BanglaBook.org

ঘরের খোলা দরজায় গলা খাঁকারি শুনে জ্যোতি তাকাল। 'প্রভাত সংবাদে'র রঞ্জন অধিকারী দাঁড়িয়ে।

জ্যোতিরই সমবয়সী বা দু-তিন বছরের বড়। তাদের আলাপ বছর পাঁচেকের। বড় বড় ক্লাবের বা আই এফ এ-র ভিতরের খবর, সাধারণত ড্রেসিংরুমের ঝগড়াঝাটি, কুৎসা ইত্যাদির দিকেই ওর ঝোঁক। খবর তৈরির জন্য তথ্যকে দুমড়ে দিতে বা পুরো মিথ্যা কথা লিখতে ওর কলম কাঁপে না। কারুর বিরুদ্ধে নোংরা কিছু রটনা করতে হলে ময়দানে প্রথমে রঞ্জনেরই খোঁজ পড়ে।

"কি রে জ্যোতি, বোম্বাই থেকে এসেই শুয়ে পড়েছিস?"

জ্যোতি উঠে বসল। ছোট টেবলটায় চায়ের কাপ পিরিচ ঢাকা দেওয়া। ঢাকা তুলে দেখল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সূর্য নিঃশব্দে কাজ করে।

"খাবি না তো, আমায় দে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাপটা তুলে একচুমুকে রঞ্জন চা শেষ করল।

"কি মনে করে?"

"মনে আবার করে তোর কাছে আসি নাকি? রোভার্স খেলে এলি, ভাবলুম যাই দেখা করে আসি, কেমন দেখলি, বুঝলি, সেটাও জেনে নেব। সাধন নাথ তো তোদের কোচ হয়ে আসছে, কেমন বুঝছিস, পারবে?"

"কি পারবে?"

"সারথিকে টানতে! অরবিন্দ মজুমদার যেখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে সেখান থেকে টানা ধরে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অবশ্য শক্ত কাজ হবে না।"

"অরবিন্দদা যে পীকে পৌঁছে দিয়েছিল সেটা দু বছর আগের কথা, তারপর থেকে সারথি নীচের দিকে গড়াচ্ছে। সাধন নাথকে এই গড়িয়ে যাওয়াটা থামাতে হবে।"

"গত দু বছর অরবিন্দ মজুমদার তাহলে কিছুই করেনি? এত যে সব স্টার রয়েছে তবু তিনি ফেইলিওর!"

"স্টার প্লেয়ার থাকলেই বুঝি টিম জেতে? একজন স্টারের কাঁধে চোট, একজন স্টারের দু মাস হাঁটু সারছে না, একজন স্টার স্টপার থেকে মিডফিল্ডার পজিসনে গিয়ে নাকি এবিলিটি লস করেছে, একজন স্টার ইনসাইড তার লিঙ্কম্যান আর আউটসাইডের সঙ্গে এখনো অ্যাডজাস্ট করে উঠতে পারছে না, একজন স্টারকে তার অরিজিন্যাল পজিশনে খেলান হচ্ছে না বলে সিটার মিস করছে—বুঝলে রঞ্জনদা এই হচ্ছে তারকাখচিত টিমের হাল!"

"এসব তো অরবিন্দ মজুমদারের আমলেরই তৈরি।"

রঞ্জন বালিশ নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। জ্যোতি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "নিশ্চয়। শেষদিকে অরবিন্দদার গাছাড়া ভাব ছিল তো বটেই। ক্লাব অফিসিয়ালরাও কি কম দায়ী? এই যে অসিত টাকা না পাওয়ার জন্য ট্রেনিংয়ে এল না, মেন্টালি ডিস্টার্বড, আনহ্যাপি, তার কাছ থেকে কি খেলা আশা করব? তবু ও রোভার্সে অন্যদের থেকে ভাল খেলেছে, কিন্তু অন্যরা?"

"জবেদের আর অজিতের মাঝখানে স্পিডে মেরে দিয়ে অরুণাচলম বল নিয়ে ঢুকে গেল, গৌতমও গোল লাইনে দাঁড়িয়ে রইল, অরুণাচলম ডান থেকে বাঁ পায়ে বল নিয়ে তাইয়ে তাইয়ে শট নিয়ে উপরের জালে বল রাখল। তারপর জবেদ আর অজিত মাঠেই ঝগড়া শুরু করল, এসব ব্যাপার তো আগে ঘটত না!"

রঞ্জন চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে মন্তব্যের জন্য জ্যোতির মুখের দিকে ত্যারছা চোখে তাকিয়ে থেকে শুধু আর একটি কথা জুড়ল, "অনেকে বলছে জ্যোতি সিরিয়াসলি খেলেনি যেহেতু অরবিন্দ মজুমদার আর নেই।"

"কে বলেছে একথা?" জ্যোতি ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে গেল। "আমার নামে কে বলেছে?"

"শুনলাম কারুর কারুর কাছে, নাম বলব না।"

"রথীন? চঞ্চলদা? অজিত, বাচ্চু, বিষ্ণু?"

"বললাম তো, নাম বলব না।"

"যতসব অযোগ্যদের ভীড় হয়েছে এখন সারথিতে। চিড়ে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে মিডফিল্ড, কি গ্রাউণ্ডে কি এয়ারে বীট করে যাচ্ছে অ্যাট ইজ, কে যে কোথায় দাঁড়াবে, কাকে রাখবে তাই ঠিক করতে পারছে না। ডিফেন্স হাসফাঁস করছে দেখে বাধ্য হয়েই নেমে এসে খেলতে হয়েছে, আর রথীন বলল কেন নেমে খেলেছি। গোল নাকি সেজন্যই আমরা দিতে পারিনি। অদ্ভুত যুক্তি! আমি ছাড়া কি গোল দেবার আর লোক ছিল না? তারা কি করছিল? তিনটে ওপেন করেছি, তিনবারই বিষ্ণু সাত-আট গজ থেকে বাইরে মারল। মূর্তি একটা হেড করে বারের ওপর তুলে দিল গোলকীপার তখন মাটিতে পড়ে! আর অরবিন্দ মজুমদারের থাকা বা না থাকার সঙ্গে আমার খেলার সম্পর্ক কি? আমি আমার খেলা খেলব। এসব বাজে রটনার উদ্দেশ্য কি?"

"উদ্দেশ্য আবার কি, তোকে পছন্দ করে না নানা কারণে তাই বলে। সাধন নাথ এলে তোর কি কোন অসুবিধে হবে?"

www.BanglaBook.org

"অসুবিধে?" জ্যোতির উত্তেজনার প্রবাহের সামনে যেন পাথরের চাঙড় পড়ল। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে উঠল তার কথার তোড়। "মফৎলাল টিমটা অঙ্কের মত ফুটবল খেলল। প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে কাজ দেওয়া আছে, প্রত্যেকে জানে কখন কোথায় তাকে থাকতে হবে। ছক কাটা খেলা। এভাবে আমি কখনো খেলিনি, আমার এই মেথডিক্যাল খেলা একদম পোষায় না। অরবিন্দদা এটা জানতেন, বুঝতেন, তাই আমাকে মাঠে ছেড়ে রেখে দিতেন। যদি আমাকে ছকের মধ্যে কেউ বাঁধতে চায় তাহলে আমার পক্ষে—"

"তাহলে তোর পক্ষে কি?—বনিবনা করে চলা সম্ভব হবে না?"

"তাই।" কথা খুঁজে না পেয়ে জ্যোতি সায় দিল।

"সাধন নাথ অনেক পাওয়ার নিয়ে আসছে। ওর কাজে বা সিদ্ধান্তে কাউকে নাক গলাতে দেবে না। যদি মনে করে কাউকে বসাবে বা তাড়াবে তাহলে কিন্তু তাই করবে।"

"তুমি বলতে চাও আমাকেও বসাবে বা তাড়াবে?—একবার চেষ্টা করে তাহলে দেখুক, কত ধানে কত চাল বোঝা যাবে।"

"কি করবি তাহলে?"

"কেন সারথি ছাড়া আর কি ক্লাব নেই?"

"তাহলে কি যাত্রীতে যাবি?"

জ্যোতি এবার বিরক্ত স্বরে বলল, "কোথায় যাব সে পরে দেখা যাবে। এখন আমি একটু ঘুমোব।"

রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। চোখে পড়ল একটা খাম মেঝেয় পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে নাম ঠিকানা পড়ে বলল, "মেয়ের হাতের লেখা। কার?"

"কার তা আমি কি করে জানব!"

জ্যোতি হাত বাড়িয়ে খামটা টেনে নিল। রঞ্জন অপেক্ষা করছে, খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করার। জ্যোতি খামটা বালিশের নীচে রেখে দিল।

"খাওয়াবি কিছু?"

"এখন ঘুমোব, তুমি বরং মোড়ের মিষ্টির দোকান থেকে কিনে খেয়ে নাও।"

জ্যোতি দশ টাকার একটা নোট দিল রঞ্জনকে। সেটা পকেটে পুরেই সে বেরিয়ে গেল। জ্যোতি অস্ফুটে বলল, "শালা।"

বালিশের তলা থেকে খামটা বার করে সে ছোট্ট চিঠিটা পড়ল।

"জ্যোতি,

তোতনের অপারেশনের জন্য যে টাকার কথা বলেছিলাম, তার আর দরকার হবে না। টাকার যোগাড় হয়ে গেছে। ভাগ্যটা এখন ভাল যাচ্ছে মনে হয়। অনুপমা যাত্রা সমাজের সঙ্গে আমার কণ্ট্র্যাক্ট হয়েছে; অ্যাডভান্স যা পেয়েছি তাতেই মনে হয় কুলিয়ে যাবে। তুমি আমার ছেলের চিকিৎসার জন্য টাকা দেবে বলেছিলে, তোমার এই উদারতা চিরকাল আমার মনে থাকবে। তোতনকে নিয়ে দোসরা রওনা হচ্ছি। আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে। ইতি,

গৌরী।

চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়ে সে দলা পাকিয়ে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিল। তার কাছ থেকে গৌরীর টাকার বা উপকার নেবার আর দরকার হল না। এটা মনে হতেই জ্যোতির মনে জ্বালাধরা একটা হতাশা কিছুক্ষণ জমে রইল।

দুদিন পর প্রভাত সংবাদের খেলার পাতায় বড় অক্ষরে হেডিংটা দেখে জ্যোতির হৃদপিণ্ডের দু'তিনটে স্পন্দন ফসকে গেল। হাতের কাগজ কেঁপে উঠল।

"সাধন নাথ কোচ হলে সারথিতে আমি থাকব না : জ্যোতি"

একি লিখেছে রঞ্জন! জ্যোতির চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল, শুধুই একটা চিৎকার।

স্টাফ রিপোর্টার লিখেছে : না, সাধন নাথের মেথডিক্যাল ফুটবলের সঙ্গে বনিবনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার ছক্ কাটা আঁক কষা ধরনের সঙ্গে আমার খেলার ধরনের একদমই মিল নেই। আমাকে ছকের বাঁধনে কেউ বাঁধতে চাইলে আমার পক্ষে তার সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে—'। "সারথির সারথি," ভারতীয় ফুটবলের উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্যোতি বিশ্বাস কথাগুলো বললেন রোভার্স থেকে ফিরে। বলার সময় তার কণ্ঠে ছিল তীব্র ঝাঁঝ আর চোখে আগুন। সারথি সঙ্ঘের মেসে নিজের ঘরে, লাল জয়পুরী প্রিন্টের বেডকভারে ঢাকা বিছানায় শুয়ে শুয়ে জ্যোতি বললেন, 'সারথি এখন ভরে গেছে অযোগ্যদের ভীড়ে। বাংলার সম্মান এরা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে এল বোম্বাইয়ে। কেউই কণ্ডিশনে ছিল না, ইনজুরি আছে অনেকের কিন্তু তারা সেকথা চেপে গেছল। আনফিট অবস্থায় খেলে তারা টিমকে ডুবিয়েছে। আমি নাকি সিনিয়ার ছিলাম না বলে কেউ একজন বা কয়েকজন অভিযোগ তুলেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সারথির জন্য আমি বুকের শেষ বিন্দু নিঃশ্বাস কুপারেজ মাঠে ঝরিয়ে দিয়ে আসতে পারি। যারা বলে আমি সিনিয়ার নই, তারা নিজেদের কি প্রমাণ করতে পারবে তারা খুব সিনিয়ার?'

www.BanglaBook.org

রাগে ফুঁসছিলেন জ্যোতি। 'বললেন, ম্যাচ হারলেই সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবার একটা চক্রান্ত সারথিতে বিষাক্ত আবহাওয়া এখন তৈরি করেছে।' এরপর তিনি প্রাক্তন কোচ এবং গণিকা গৃহে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া অরবিন্দ মজুমদার সম্পর্কে বলেন, 'এই সব ব্যাপার অরবিন্দদার আমলেই তৈরী। তার গাছাড়া ভাবের জন্যই শেষদিকে প্লেয়াররা আস্করা পেয়েছে।' অবশ্য অরবিন্দ মজুমদারের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেও তিনি ভোলেননি। বলেন, 'সারথিকে তিনি যে পীকে তুলে দিয়ে গেছেন, সাধন নাথের পক্ষে তার রাশ ধরে থাকা শক্ত কাজ হবে না। তবে এতগুলো স্টার প্লেয়ার সামলানোর মত ব্যক্তিত্ব তার আছে বলে মনে হয় না।'

প্রশ্ন করি, সাধন নাথের সঙ্গে যদি মতের মিল না হয় তাহলে, আপনি কি অন্য দলে যাবেন? উত্তরে কলকাতার সবথেকে দামী এই ফুটবলারটি বিষাদভরা দৃষ্টি মেলে, সজল কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে যদি তিনি তাড়াতে চান তাহলে নিশ্চয় অন্য ক্লাবের কথা ভাবব। ফুটবলই তো আমার প্রাণ, আমার সাধনা। তবে মনে হয় না সাধন নাথ আমার খেলা নষ্ট করার মত কিছু করবেন।' চলে আসার আগে জ্যোতি বিশ্বাস আমার দিকে কেউটের ছোবলের মত একটা কথা ছুঁড়ে দিলেন, 'কারা যেন বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি যুগের যাত্রীতে চলে যাব? লিখে দিতে পারেন, সারথিতেই আমি জন্মেছি সারথিতেই আমি মরব।'

পড়ার পর জ্যোতি শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। তার মুখ দিয়ে বেরোন কথা বলে বলে যা সব লেখা হয়েছে নিশ্চয় সারথির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই তা পড়বে। একটা ব্যাপার সে পরিষ্কার জেনে গেল, এখন সে যতই প্রতিবাদ করুক তার বন্ধু বা হিতৈষী রূপে সারথির কাউকে সে আর পাশে পাবে না। সে একা হয়ে গেল। প্রত্যেকটি সহ খেলোয়াড় তার উপর চটবে, সাধন নাথ তো রীতিমত অপমানিত বোধ করবে আর অরবিন্দদা ভাববেন, বেইমান।

এত ক্ষতি মানুষের প্রতি কোন মানুষ যে অকারণে করতে পারে, জ্যোতি তা বুঝে উঠতে পারছে না।

আগাগোড়া বিকৃত এই রিপোর্ট অত্যন্ত চতুরভাবে সারথি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

পাথরের মত বসে থাকা জ্যোতির চোখ বেয়ে টপটপ জল পড়ল লাল জয়পুরী বেডকভারে।

॥ আট ॥

নান্টুকে দিয়ে দাশুদা খবর পাঠিয়েছে, এখুনি দেখা কর।

জ্যোতি দেখা করতে গেল। দাশুদা ফ্ল্যাটে একাই ছিল।

"এই যে। রোভার্স থেকে ফিরে এসেই খবরের কাগজে স্টেটমেন্ট ছেড়েছিস দেখলুম।, এসব রোগ তো তোর আগে ছিল না!"

"আমি কোন স্টেটমেন্ট দিইনি। রঞ্জন আগাগোড়া বানিয়ে লিখেছে। ও গল্প করার জন্য এসেছিল, আমিও সেই ভাবে কথা বলেছি। এইসব কথা যে লিখে দেবে, তাও হয়কে নয় করে তা তো জানতাম না! আর আমাকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি যা বলছি তা ছাপা হবে। তাহলে কনসাশ হয়ে কথা বলতাম। রিপোর্টাররা যে এত জঘন্য, নীচ, মিথ্যাবাদী হয় তা আমার ধারণায় ছিল না।"

"আগাগোড়াই মিথ্যে লিখে দিল? তুই কিছুই ওকে বলিসনি?"

দাশুদার বলার ভঙ্গিতে সন্দেহ এবং কৈফিয়ৎ চাওয়া দুটোই রয়েছে।

"ওর সঙ্গে আমার সামান্যমাত্র কথা হয়েছিল আর তাছাড়া এভাবে এসব কথা আমি বলিইনি। অথচ…"

"তুই কি প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিস?"

"আজই পাঠিয়ে দিয়েছি একটা ছেলের হাত দিয়ে।"

"ছাখ ছাপে কি না আর ছাপলেও কেটেকুটে কতটা রাখে!"

"আমি আর কি করতে পারি বল?"

জ্যোতি অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। দাশুদা নান্টুকে ইশারা করল বীয়ার দেবার জন্য।

"খুব ক্ষতি হলো তোর আর সারথিরও। এইসব খবরের কাগজের লোকগুলোকে আর ক্লাবে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়। সন্তোষদাকে বলব নোটিস দেবার জন্য, প্লেয়াররাও যেন ওদের কাছে মুখ না খোলে।"

"কোন কাজ হবে না তাতে। প্লেয়াররা নিজেরাই যেচে গিয়ে খবর দেয়, তাদেরও তো স্বার্থ আছে!"

"তোর সঙ্গে সাধন নাথের একটা হিচ তৈরি করে দিল। এতে ক্লাবের ক্ষতিই হবে। যদি রেজাল্ট খারাপ হয় এবার, তাহলে কিন্তু মেম্বার-সাপোর্টাররা তোকেই দায়ী করবে। বলবে, জ্যোতি বিশ্বাস কো-অপারেট করেনি কোচের সঙ্গে। অরবিন্দ

www.BanglaBook.org

মজুমদারের লোক তো, তাই সাধন নাথকে কাজ করতে দিচ্ছে না। সাপোর্টাররা তোর পেছনেই তখন লাগবে।"

জ্যোতি বিব্রত বোধ করল। ব্যাপারটা যে এই রকম একটা চেহারা নিতে পারে, তার নিজেরও মনে হয়েছে। সাপোর্টাররা তাকে মাথায় তুলে যতই নাচানাচি করুক, মাথা থেকে মুহূর্তেই ফেলেও দিতে পারে। অরবিন্দদা আসার আগে তাঁবুতে ইট ছোড়া, কয়েকজন মেম্বারের গাড়ির কাচ ভাঙা, এমনকি দুজন প্লেয়ারের স্কুটারও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি দু সপ্তাহ ক্লাবের ছায়া মাড়ায়নি। ওদের বাড়িতেও পুলিশ পোস্ট করতে হয়েছিল।

"এবার কাকে কাকে আনবেন ঠিক করেছেন?"

"ওসব ব্যাপারে আমি নেই, থাকিও না। যা করার চঞ্চল, সন্তোষদা আর লালচাঁদই করবে। সাধন নাথ আসছে, ওর সঙ্গেও কথা বলে ঠিক করা হবে, কাকে কাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে শৈবালকে ফিরিয়ে আনা যে হবে এটা ধরে নিতে পারিস।"

"সাধন নাথ ওকে পছন্দ করে। ক্লাবেও অনেকে ওকে চাইছে। অমিত তো থাকবে না জানা কথাই, জবেদও বোধহয় ওর সঙ্গেই যাত্রীতে চলে যাবে। যাই হোক্ খুব একটা ক্ষতি আমাদের হবে না। কিন্তু তোর এই কাগজের স্টেটমেন্টটা…"

"আমার স্টেটমেন্ট নয় দাশুদা।"

"ওই হল।"

দুজনে বীয়ারের গ্লাস নান্টুর হাত থেকে নিল।

"তোর জন্য নেপাল থেকে ভেলভেট কর্ডের একটা প্যান্ট পীস এনেছি। জলিলকে মাপটা দিয়ে আসিস।"

এই ধরনের উপহার দাশুদার কাছ থেকে পাওয়াটা জ্যোতির কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার। সে উৎসাহ প্রকাশ করল না, শুধু বলল, "আছে তো অনেক।"

"থাকুক আর একটা।"

"ব্যবসার কাজে গেছলে?"

"হ্যাঁ। তোকে তো ব্যবসায় আর নামাতে পারলুম না। টাকাগুলো কি করবি, বাড়ি?"

"হ্যাঁ। নিজের একটা বাড়ি আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।"

"তারপর বিয়ে। ঠিক করেছিস?"

"না।"

"দেখব মেয়ে ?"

"ওরে বাবা, না না, এসব ব্যাপারে তুমি মাথা দিও না।"

"কেন, আমি কি খুব খারাপ মেয়ে তোকে দিয়েছি ?"

জ্যোতি গ্লাসে চুমুক দিল অনেকটা সময় নিয়ে। না, দাশুদা ভাল মেয়েই দিয়েছিল। একটু বেশি ভাল।

"গৌরীর ছেলের হার্ট অপারেশন হবে, ভেলোরে। তুমি কি তা জান ?"

"সে কি! কই আমায় তো বলেনি কিছু ? ও কি কলকাতায় আছে ?"

"ছেলেকে নিয়ে ভেলোর গেছে। দোসরা রওনা হয়েছে।"

"তুই জানলি কি করে ?"

চিঠি দিয়ে গেছে।

"অদ্ভুত এই মেয়ে জাতটা। তিন চারদিনের মধ্যে ওকে দরকার, আর কিনা না বলে চলে গেল!"

"ছেলের হার্ট অপারেশন।"

"তাতে কি হল। দুচারটে দিন দেরী করে গেলে কি ছেলে মরে যেত ? এতদিন তো বিনা অপারেশনেই বেঁচে রয়েছে।"

জ্যোতি অবাক বোধ করল দাশুদার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠায়। তার মনে হল, এই সময় এইভাবে কথাগুলো বলা একমাত্র নিষ্ঠুরের পক্ষেই সম্ভব। মায়ের কাছে ছেলের জীবনের মূল্য এবং প্রয়োজন যে কতটা তা বোঝার মত বোধশক্তি এই লোকটির নেই। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

"এখন আমি কাকে আবার যোগাড় করি।"

গোঁজ হয়ে রইল দাশুদা। জ্যোতি গ্লাস শেষ করে নাণ্টুর হাতে দিল ভরে দেবার জন্য। প্লেট থেকে চিকেন পকৌড়া তুলে মুখে দিল। কিছুক্ষণ পর দাশুদার চিন্তাবিকৃত মুখটা স্বাভাবিক হয়ে এল। চোখে-মুখে হালকা স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠল।

জ্যোতির বলতে ইচ্ছে করেছিল, গৌরী আর এই জীবনে ফিরে আসবে না, ওকে দিয়ে আর কোন কাজ তুমি করাতে পারবে না। সে নিজের একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু পরিবেশটা অস্বস্তিকর করে তুলতে সে চাইল না।

"জ্যোতি চাকরি-বাকরিতে এবার ঢুকে পড়। খেলা তো চিরকাল থাকবে না, এই দরও তোর থাকবে না। বাকি জীবনটা টানবি কি করে ? দেখছিস তো দিনকাল কেমন বদলে যাচ্ছে। কাগজে তোর পেছনে মিথ্যেমিথ্যি যে রকম লেগেছে···এসব জিনিস দশ বছর আগেও ছিল না, ভাবাই যেত না।"

www.BanglaBook.org

"তখন প্লেয়ারদের এত টাকা দেয়া হত না বলেই নোংরামিটা ছিল না।

"হবে।" দাশুদা চিকেন পকৌড়া তুলল। "আচ্ছা জ্যোতি তুই যে বলেছিস, সারথিতে তোর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত অরবিন্দ মজুমদারের আমলেই তৈরি, তার গাছাড়া ভাবের জন্য···"

জ্যোতিকে হাত তুলতে দেখে দাশুদা থামল।

"আবার বলছি আমি বলিনি। বলেছিলাম, স্টার স্টাডেড টিমের এই হাল অরবিন্দদার শেষদিকে গাছাড়া ভাবের জন্য আর অফিসিয়ালদের জন্য হয়েছে। খুব কি ভুল বলেছি ?"

"তোর কি মনে হয়েছে কখনো অরবিন্দদা আর পারছে না, সারথিকে ডোবাচ্ছে, এবার সরে যাওয়া উচিত ? মনে হয়নি কি, টিমের একটা নতুন অ্যাপ্রোচ এবার দরকার, নতুন আইডিয়া নিয়ে সারথি খেলুক।"

"হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হতো।"

"কিন্তু অরবিন্দ মজুমদার থাকলে তা সম্ভব নয়। কিন্তু ওকে সরানও সম্ভব নয়।"

"তুমি ওকে সরে যেতে বলেছিলে ?"

দাশুদা পিটপিট করে তাকিয়ে, মুখে ক্ষীণ হাসি।

'আমার কাছে এটা চেপে গেছলে।" জ্যোতি ঈষৎ অভিমান দেখাল।

"সব কথা কি বলা যায় ? সারথির ভাল-মন্দ আমার কাছে প্রথম প্রায়রিটির ব্যাপার। সারথির জন্য এমন কোন কাজ নেই, তা যত খারাপই হোক, করতে না পারি!"

"সেজন্য তুমি আমাকে ছুরি মারতে পার ?"

"যদি মনে হয় তোর জন্য সারথির ক্ষতি হচ্ছে···তা হলে···যদি মনে হয় তোকে সরিয়ে দিলে সারথির ভাল হবে···তা হলে···।"

দাশুদা গ্লাসটা মুখে তুলল। জ্যোতির মনে হল, কণ্ঠস্বর যতই লঘু হোক না, 'তা হলে' শব্দটায় ইস্পাত-ফলার তীক্ষ্ণতা ছিল। সিরসির করে উঠেছে কলিজা। তার অদ্ভুত ধরনের অস্বস্তি লাগছে। সোফায় গা এলিয়ে দেওয়া, শান্ত মুখ, পাজামা-পাঞ্জাবি-পরা লোকটি, পরিশ্রমী, বহু টাকা রোজগেরে ব্যবসায়ী কিন্তু নিজের কোন অস্তিত্বই নেই! ফুটবল ক্লাবই ওর ধ্যান-জ্ঞান! অথচ ক্লাব থেকে একটা পয়সাও নেয় না।

"দাশুদা একটা কথা বলব ?"

"বল।"

"ভোরবেলা অরবিন্দদার বাড়িতে গাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে আর বৌদিকে তুলে দেশের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলে ওদের লোকলজ্জার হাত থেকে কি না বাঁচাতে। কিন্তু ব্যাপারটা তো এতদূর না-ও গড়াতে পারত, মানে কোর্ট পর্যন্ত যেতই না যদি সেই রাত্তিরেই থানা থেকে অরবিন্দদাকে বার করে আনা হত।"

"নিশ্চয়, কোর্টে কেস উঠতই না যদি একবার কেউ তখন আমায় জানাত। কিন্তু আমি তো জানলুম খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে।"

"অত ভোরেই তুমি রিপোর্ট পড়ে গাড়ি নিয়ে ছুটে গেলে? তুমি তো অনেক দেরিতে ঘুম থেকে ওঠ জানি।"

"সেদিন অনেক রাতে জামশেদপুর থেকে ফিরেছিলুম, আর ঘুমোইনি। ভোরে কাগজ খুলে খবরটা পড়েই তো আমি স্তম্ভিত। প্রথমেই মাথায় হিট করল, এ খবর পড়ে ওর বৌ, যে পঙ্গু দুর্বল, সে তো হার্টফেল করবে! তাই গাড়ি নিয়ে ছুটলাম।"

জ্যোতি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল দাশুদার মুখ। প্রথমেই একটা চকিত ইতস্তত ভাব ফুটে উঠেছিল। তারপর স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে কথাগুলো বললেও তার মনে হচ্ছিল দাশুদা বানিয়ে বলছে।

হঠাৎই তার মনে পড়ল, সেদিন সল্ট লেকে অরবিন্দদার ফ্ল্যাট থেকে এখানে এসে নীচে বাইকটা রাখার সময় দরোয়ানকে সে দাশুদার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। দরোয়ান জানিয়েছিল, দাশুদা গত রাত্তিরে এসে আবার বেরিয়ে গেছে গাড়িতে। এক রাত্তিরেই কি জামদেশপুর গিয়ে আবার সেই রাতের মধ্যে ফিরে আসা যায়? হয়তো যায়! কিন্তু দাশুদা যে মিথ্যা কথা বলেছে, সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন?

"আমিও খবরেরর কাগজ থেকে প্রথম জানলাম। আগে যদি জানতাম তা হলে থানা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতাম।"

"নিশ্চয়, যে কেউ করত। জ্যোতি, আমি শুধু ভাবছি অরবিন্দ মজুমদার সেই রাতে থানা থেকে কাউকে, চঞ্চল বা কিরণ বা সন্তোষদা কিংবা আমাকেও যদি একবার ফোন করত তা হলে ব্যাপারটা হাস-আপ করে দেওয়া যেত। পার্ক স্ট্রিট, হেস্টিংস, বৌবাজার কোন্ থানায় না আমার চেনা ও সি আছে? অত বড় নামী কোচ, তা ছাড়া অনেক পুলিসও তো ফুটবল নিয়ে মাতামাতি করে, ওকে যদি চিনত তা হলে ছেড়েই দিত। পরে শুনলাম সেদিন থানায় উনি নিজের নাম না বলে অন্য নাম বলেছিলেন। আর থানায় তখন ছিল ছোটবাবু, সে ফুটবল কেন,

www.BanglaBook.org

কোন খেলা নিয়ে একদমই মাথা ঘামায় না তাই চেহারাও চিনতে পারেনি। ব্যাপারটা বড় স্যাড, বড় দুঃখের হয়ে রইল।"

"তুমি আর দেখা করেছ অরবিন্দদার সঙ্গে?"

"না। একদম অজ পাড়াগাঁ, সেই রূপনারায়ণ নদীর ধারে রাজপুর, যাওয়ার সময় আর পেলাম কোথায়।"

"আমি একবার যাব ভাবছি।"

"এখন যাসনি, আর একটু থিতোতে দে, স্বাভাবিক হতে দে লোকটাকে। ভীষণ আপসেট হয়ে গেছল, একবার তো বলেও ফেলেছিল সুইসাইড করবে। তবু ভাল ধারে-কাছে ভদ্দরলোকের বাস নেই যে খবরের কাগজ পড়ে ওকে উত্ত্যক্ত করবে। ধূ ধূ ক্ষেত, খাল, পুকুর, গাছ আর চাষাভুসো মানুষ, মনে হয় বাকি জীবন এদের নিয়ে ভালই কাটাতে পারবে। আমরা গিয়ে ওকে ডিস্টার্ব না করাই ভাল।"

বীয়ারের ছ'টা খালি বোতল দেয়ালের ধারে সাজিয়ে রাখা। নান্টু আর দুটো বোতল বার করে আনল ফ্রিজ থেকে।

"জ্যোতি, এ বছরটা সারথির পক্ষে খুবই ভাইটাল। নতুন কোচ আসছে, টিমও নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। তোকে কিন্তু এ বছর খেলতে হবে···জান-মান লড়িয়ে খেলতে হবে।"

দাশুদা এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে তাকিয়ে রইল। চকচক করছে চোখ। মুখটা ঈষৎ ফুলো, গলার স্বর একটু চড়া। ভিতর থেকে একটা উত্তেজনা বেরিয়ে আসার জন্য দাপাচ্ছে ওর চাহনিতে।

"কাগজে যা বেরিয়েছে, যতই প্রতিবাদ কর কেউ তোর কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, নিশ্চয় কিছু অন্তত বলেছে, নইলে অমনি অমনি কি লিখে দিল? টিমে যত ঝগড়াঝাটি, খেয়োখেয়ি সব তোকে কেন্দ্র করে। তোর জন্য টিম স্পিরিট নষ্ট হয়েছে।"

"বলছেন কি দাশুদা?" জ্যোতি গ্লাস নামিয়ে রাখল।

"ঠিকই বলছি। কিন্তু এসবের জন্য ক্লাব সাফার করেনি। তুই একাই খেলা দিয়ে সেটা পুষিয়ে দিতিস। কিন্তু এখন আর তা পারছিস না। ভাল প্লেয়ার আর আসছে না, তোকে খেলাবার মত যোগ্যতা এখন আর কারুর নেই। এইসব সাধারণ স্ট্যাণ্ডার্ডের প্লেয়ার দিয়েই এবার কাজ চালাতে হবে। তুই এদের মধ্যে মিস ফিট। তুই ফালতুর মত এখন মাঠে দাঁড়িয়ে থাকিস মাত্র। তোর খেলা

এরা বোঝে না, একটা বল দিতে পারে না, তোর কাছ থেকে নিতেও পারে না। তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে জ্যোতি। এখন ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াদের আমল আসছে, এর মধ্যে রেসের ঘোড়া বেমানান, তাই নয় ক্ষতির কারণও।"

জ্যোতি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে দাশুদা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। খালি গ্লাসটায় বোতল উপুড় করে ভরে নিতে নিতে চিৎকার করল, "নাণ্টু···পকোড়া দে।" গ্লাস বেয়ে বীয়ারের ফেনা মেঝেয় পড়ছে। দাশুদা গ্লাসে চুমুক দিতেই ঠোঁটের উপর ফেনা আটকে গেল।

"যে টিমে ট্যালেণ্ট নেই সেই টিমকে অন্যভাবে কোচ করে খেলাতে হয়। স্কিলের ঘাটতি এনডিওরেন্স আর স্ট্যামিনা দিয়ে পোষাতে হয়। হ্যাঁ, ছক কেটে অঙ্কের মত করেই সারথি খেলবে, তাই সাধন নাথকে আনা। ওর কথা মত তোকে চলতে হবে, খেলতে হবে এবার থেকে। ইনডিভিজুয়াল প্লেয়ার, ব্রিলিয়ান্স এসব এখন ভুলে যা, টিমের স্বার্থে তোকে এবার অন্যভাবে, সবার সঙ্গে মানিয়ে খেলতে হবে। যদি খেলতে না পারিস তা হলে···।"

ঝনঝন করে গ্লাসটা ভেঙে গেল দেয়ালে লেগে। দাশুদা উঠে দাঁড়াল, "মেসে ফিরে যেতে হবে না, এখানেই শুয়ে পড়। আমার ঘুম পাচ্ছে। গুড নাইট।"

দাশুদা বেরিয়ে গেল। একটু পরে নীচ থেকে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ এল। বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত জ্যোতি বসে রইল। 'তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে জ্যোতি' কথাগুলো তার মাথার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বড় হয়ে উঠছে কর্কশ থেকে আরো বীভৎস কর্কশ হয়ে।

তার ভয় করছে। হয়তো অরবিন্দদার মতই বদনামের বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে বিদায় নিতে হবে। তখন সে যাবে কোথায়? সারথির বাইরে কিছুই সে চেনে না, জানে না! ফুটবলের বাইরে জীবনটা কেমন তা সে কখনো খোঁজেনি। সোফায় হেলান দিয়ে মুখটা সিলিংয়ের দিকে তুলে জ্যোতি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুদিন পর প্রভাত সংবাদে সাধন নাথের ছবিসহ সাক্ষাৎকার ছাপা হল। সারথির আঙিনায় বেঞ্চে বসা, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, হাসি-খুশি মুখ, হাতের মুঠো ঘুঁসির মত পাকিয়ে তুলে ধরা। সতর্ক, মাপা কথাবার্তা। তার মূল বক্তব্য মোটামুটি এই রকম—সারথি সঙ্ঘের বিরাট ঐতিহ্য সম্পর্কে আমি সচেতন। আমি যথাসাধ্য করব, ক্ষমতায় যতটা কুলোয় আমি নিজেকে নিংড়ে দেব ক্লাবের সম্মান

www.BanglaBook.org

রক্ষার জন্য, ক্লাবকে আরো বড় সম্মান এনে দেবার জন্য। কিন্তু এ কাজ একার দ্বারা সম্ভব নয়। কোন কোচই তা পারে না। আমি নির্ভর করব প্লেয়ারদের টিম স্পিরিটের ওপর, কর্মকর্তাদের সহযোগিতার ওপর। মেম্বার-সাপোর্টারদের শুভেচ্ছাই হবে আমার প্রেরণা, সব কিছুর উপর আমি চাইব কঠিন পরিশ্রম। প্রপার ওয়ার্ক রেট ছাড়া কোন দলই সফল হতে পারে না, বিশেষত আজকের এই কম্পিটিশনের যুগে। যদি আমরা কঠিন পরিশ্রম করি, সবাই যদি নিজেকে উজাড় করে দিই, তা হলে আমাদের সাফল্য কেউ আটকাতে পারবে না।"

প্রশ্ন ছিল, টিমে কোন অদলবদল করবেন কি না। তাইতে সাধন নাথ, একটু হেসে বলেন, 'এই তো সবে এলাম। আগে আমায় ছেলেদের দেখতে বুঝতে দিন।'

'জ্যোতি বিশ্বাসকে কিভাবে খেলাবেন, কিছু ভেবেছেন কি?'

'কিভাবে খেলাব, মানে?'

'আপনি যে ধরনের মেথডিক্যাল ফুটবল চান, জ্যোতি তো সেরকম ভাবে খেলায় অভ্যস্ত নয়।' এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

'ক্লাবের স্বার্থে, টিমের স্বার্থে তা হলে তাকে খেলা বদলাতে হবে।' অতঃপর সাধন নাথ এই বিষয়ে আর আলোচনায় রাজি হলেন না।

।। নয় ।।

সিজনের প্রথম দিন প্র্যাকটিসের সকালে ড্রেসিং রুমে জ্যোতি বুট পরছে তখন রথীন বলল, "সাধনদা তোকে আগে একবার দেখা করতে বলেছেন।"

"কি জন্য?"

"বলতে পারব না।" রথীন গাম্ভীর্য রক্ষায় ব্যস্ত রইল। সাধন নাথ এসে তার চাকরিটা খায়নি, এ জন্য সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম সে সাধন নাথের সঙ্গে একা মুখোমুখি হল। এর আগে ড্রেসিং রুমে অন্য সবার সঙ্গে আরো বেশি ওয়ার্ক রেটের প্রয়োজন সম্পর্কে কথাবার্তা ছাড়া আর তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

সাধন নাথের ঘরে, যেটা আগে অরবিন্দ মজুমদারের ঘর ছিল, পা দেওয়ামাত্রই, "কেমন লাগছে তোমার, এখানে?' এমন প্রশ্নের সামনে জ্যোতি পড়ল।

"লাগছে কেমন?" সাধন নাথ আবার বলল।

"আমার তো এখানে সাত বছর হয়ে গেল!"

"আমি যা জিজ্ঞাসা করলাম তার উত্তর দাও।"

"বুঝলাম না।"

"সহজ সরল প্রশ্ন। সাত বছর বলতে কি বোঝাচ্ছ?"

"সোজা স্পোর্টিং ইউনিয়ন থেকে।"

"তুমি অতীতের কথা বলছ আর আমি বলছি বর্তমান নিয়ে। কতদিন সারথিতে আছ বা অতীতে কি করেছ তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এখানে আমি যেদিন শুরু করব, সেদিন অন্যদেরও শুরু বলে আমি ধরে নেব। সবাইকেই আমি খুঁটিয়ে দেখলাম, কে কি রকম তাও আমি জানি। একটা কথা প্রথমেই বলে রাখছি, টিমে কারুরই জায়গা বাঁধা নয়। অনেক ঢিলেঢালা জিনিস নজরে পড়েছে, অবশ্য যেভাবে টিম চালান হচ্ছিল তাই থেকেই এসব এসেছে। বৃহস্পতিবার টিম মিটিং, কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে নিতে চাই।"

জ্যোতি দাঁড়িয়ে আছে ডেস্কের সামনে। সাধন নাথ তাকে বসতে বলেনি, কথা বলার সময় মুখের দিকেও তাকায়নি। তার উপস্থিতির কোন গুরুত্বই সাধন দিতে চায়নি।

"আমি মিড ফিল্ডে তোমাকে খেলাব। অ্যাটাক আর মিড ফিল্ডের মধ্যে বড় একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ওখানেই দেখেছি সারথির মুভগুলো ভেঙে যায়। ওপরে আরো পেনিট্রেশন চাই, কিন্তু সেটা হয় না যেহেতু মিড ফিল্ডে আরো বেশি স্কিমিং দরকার। এখানেই তোমাকে আমি চাই। অসিত চলে গেছে, বাচ্চুকে আমি অ্যাটাকে আনব, তুমি তার পিছনে থেকে খেলবে, অ্যাটাক তৈরি করাবে' দরকার হলে নিজেও উঠবে।"

"তার মানে আমাকে আপনি হাফ-ব্যাক লাইনে খেলাতে চান?"

"মিড ফিল্ডে, উপর দিকে। এতে তুমি আরো স্কোপ পাবে।"

"আমি মিড ফিল্ডের প্লেয়ার নই।"

সাধন নাথ চোখ তুলে জ্যোতির মুখটা দেখে নিল। চশমাটা খুলে ডেস্কের উপর রেখে চেয়ারে অলস ভঙ্গিতে এলিয়ে পড়ল।

"তুমি সারথির প্লেয়ার, আর যেখানে তুমি সব থেকে কার্যকরী হবে বলে আমি মনে করব, সেখানেই তুমি খেলবে।"

"কিন্তু আমি তো স্ট্রাইকার।"

"তুমি টিমের একজন, আর আমি ঠিক করব টিম সাজানোর ব্যাপারটা।"

www.BanglaBook.org

"স্ট্রাইকারের পিছনে থেকে কোনদিন খেলিনি, আমি আনকমফর্টেবল ফিল করব অনভ্যস্ত জায়গায়।'

"তা হলে তোমায় আনকমফর্টেবলই থাকতে হবে। এখন থেকে তোমার কাজটা কি হবে সেটাই তোমায় বলে দিলাম।

"এভাবে আমি কখনো খেলিনি।"

"ওসব অতীতের কথা। কে কবে কী করেছে তাই নিয়ে আমি মাথাব্যথা করতে চাই না। সারথিতে যদি নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে চাও, তা হলে যা বলছি তাই করো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?"

জ্যোতি বুঝল কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। সাধন নাথ নানান আইডিয়া নিয়ে এসেছে, কিন্তু জ্যোতি জানে তার একটাও খাটবে না। এই ধরনের অদল-বদল আগেও করা হয়েছিল অরবিন্দদার আমলে, আবার বাতিলও করতে হয়েছে। সাধন নাথকেও কাঠ-খড় পুড়িয়ে শেষকালে তা জানতে হবে।

"বেশ, চেষ্টা করে দেখব।"

"চেষ্টা নয়, করতেই হবে।"

"আপনি যখন কোচ, তখন তো করতেই হবে।"

"সেটা মনে থাকে যেন।"

টিম মিটিংয়ে জনা কুড়ি প্লেয়ার হাজির হয়। তার মধ্যে ছিল শৈবাল, বিপ্লব, পরিতোষ, যাদের আবার সারথিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গৌতম গত দু বছর অধিনায়ক ছিল। সাধন নাথের পরামর্শে নতুন অধিনায়ক হয়েছে শৈবাল। গৌতম এতে খুশি নয়।

"সিজনের শুরুতে সিংহের মত গর্জন তুলে সিজনের শেষে ভেড়ার মত ব্যা ব্যা করা আমার স্বভাব নয়।" টিম মিটিংয়ে এই ভাবে শুরু করল সাধন নাথ। "কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে সব কিছু ওজন করে, মেপে নেওয়াই আমার রীতি। এতদিন প্র্যাকটিসে যা দেখেছি তাতে এটুকু বুঝলাম সব বিভাগেই শান পড়া দরকার, পালিস দরকার। ডিফেন্সে গলদ দেখা যাচ্ছে, অ্যাটাকেও কিছু পারছি না। এর সিক্রেটটা রয়েছে মিড ফিল্ডে। মিড ফিল্ডে দখল নাও তা হলে ম্যাচও দখলে পাবে। তোমাদের এক-দু'জনকে ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছি কি আমি চাই। একজন মধ্যমণি কিংবা বলা যায় পিভট যাকে কেন্দ্র করে টিমটা ঘুরবে। এটা শৈবালের কাজ, তাই ওকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে। এর আগে গৌতম ক্যাপ্টেন ছিল। কিন্তু মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চিৎকার করে গলা ব্যথা করা ছাড়া

গোলকীপার ক্যাপ্টেনের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। রেফারির হুইসল মত খেলবে আর খেলবে শৈবাল যেভাবে খেলাবে।"

জ্যোতি আড়চোখে দেখল গৌতম মুখ নীচু করে জুতোর ডগা দিয়ে মেঝেয় আঁচড় কাটছে আর শৈবাল ক্লাসের ফার্স্টবয়ের মত মনোযোগে সাধন নাথের কথাগুলো শুনছে।

"আর একটা কথা। লক্ষ্য করছি ক্রসফিল্ড পাস আমরা ভালমত কাজে লাগাচ্ছি না। আর একটা জিনিস, ডিফেন্সকে সাহায্য করতে ফরোয়ার্ডরা খুব কমই ফানেল করে নামছে। আমাদের একটা ছক তৈরি করতে হবে জোনাল ডিফেন্সের। আমার মতে, ডিফেন্স আর অ্যাটাক পরস্পরের পরিপূরক, এটা মিলে যায় একটা জায়গায়—মিড ফিল্ডে…"

এইভাবে আরো মিনিট পনের সাধন নাথ কথা বলে গেল। জ্যোতি একটি প্রশ্নও তোলেনি। শুধু মনে মনে বলল, ডেসিং রুমে কথা বলেই যদি ম্যাচ জেতা যায় তা হলে সারথি এবার অবধারিত লিগ চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে।

॥ দশ ॥

প্রথম আটটি ম্যাচে সারথি পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করল তিনটি ড্র ও ইস্টবেঙ্গলের কাছে এক গোলে হেরে। তাঁবু রক্ষার জন্য এখন পুলিস পাহারা থাকছে খেলার পর। তবে এখনো ইঁটপাটকেল ছোঁড়া শুরু হয়নি। শুধু খেলার পর বাপ-মা-তোলা অশ্রাব্য গালাগালির মধ্য দিয়ে সারথির খেলোয়াড়দের মাঠ থেকে তাঁবুতে ফিরতে হয়। গত ম্যাচে তাঁবুতে ফেরার সময় জ্যোতির মুখে থুথু দিয়েছিল একজন গ্যালারি থেকে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটির পাঁজরে ঘুঁষি মারে। তখন কয়েকজন জ্যোতিকে মারার চেষ্টা করেছিল। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াত যদি না গৌতম ও শৈবাল তাকে টেনে তাঁবুতে আনত।

পরের ম্যাচ বান্ধব সমিতির সঙ্গে। কিক অফের সময় জ্যোতি দাঁড়াল বাচ্চুর পিছনে। সমিতির সেন্টার ফরোয়ার্ড কিক অফ করে বল দিল তার ইনসাইড লেফ্‌টকে, সে পিছনে ঠেলে দিতেই অভ্যাসমত জ্যোতি পাসটা ধরার জন্য বাচ্চুর সামনে এগিয়ে ছুটল। তারপরই মনে পড়ল, তার পিছিয়ে থাকার কথা। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে এল।

পাঁচ মিনিট পর সে প্রথম বল স্পর্শ করল। সারথির হাফলাইনের মাঝখান

www.BanglaBook.org

থেকে বলটা যখন এল সে তখন চোখের কোণ থেকে দেখে নিয়েছে শৈবাল, বাচ্চু এবং সত্যমূর্তির সঙ্গে সমিতির ডিফেণ্ডাররা সেঁটে রয়েছে। সমিতির এক ডিফেণ্ডার বল কাড়ার জন্য তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে জ্যোতি ট্যাকল এড়িয়ে বল নিয়ে ছুট দিল।

পেনাল্টি এলাকার কিনারে তিনজন ডিফেণ্ডার তার অপেক্ষায় পথ আটকে রয়েছে। জটলা এড়াতে, প্রকৃষ্ট উপায় লেফট উইংকে হাই লব করে বল দেওয়া।

"ব্যাকপাস।" জ্যোতি তার পিছনে শৈবালের চিৎকার শুনেই ব্যাক হিল করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে প্রচণ্ড জোরে নেওয়া শটটা তার ডান কাঁধে লাগল এবং সে মুখ থুবড়ে পড়ল।

"নীচু হবি তো?" তাকে হাত ধরে টেনে তুলে শৈবাল বলল।

"ওখান থেকে কি শট নেয়?" রেগে জ্যোতি বলল।

"সোজা বলটা গোলে যেত যদি তুই মাথাটা ঝোঁকাতিস। গোলি বল দেখারই সময় পেত না।"

হাফ টাইমে সাধন নাথ তাকে বলল, "বলটা যদি প্রথমেই শৈবালকে দিয়ে দিতে তা হলে এখন এক গোলে এগিয়ে থাকতাম। তুমি অত উঠে খেলছ আবার?"

"ওকে মার্ক করে ছিল, তাই ডিফেন্সকে সরাবার চেষ্টা করেছিলাম।"

"শৈবালকে পিছনে রেখে দিয়েছিলে বলেই গাধার মত ব্যাকপাসটা করতে হল।"

"ও বল চাইল।"

"চাইবে না তো কি করবে? যা খেলছ, সেটা কি ফুটবল ম্যাচ না দাড়িয়া-বান্ধা? এবার একটু বুদ্ধি খরচ করে খেল।"

"আমিই কি শুধু বুদ্ধি খরচ করব?"

"ম্যাচ উইনার তুমিই।"

দ্বিতীয়ার্ধে জ্যোতি যতই পিছিয়ে খেলার চেষ্টা করুক না কেন চুম্বকের আকর্ষণের মত সে এগিয়ে যাচ্ছিল গোলের দিকে। রথীন সাইডলাইনে হাত তুলে লাফাচ্ছে তাকে পিছিয়ে যাবার জন্য। অবশেষে খেলা থামিয়ে রেফারি তার কাছে গিয়ে জানিয়ে এল, আর একবার এমন করতে দেখলে ফেন্সিংয়ের ওধারে তাকে পাঠিয়ে দেবেন।

মিড ফিল্ডে তার কাছ থেকে বল ছাড়া খেলার এবং আক্রমণে তার কোন ভূমিকা নেই এমন আক্রমণ গড়ে তোলার প্রত্যাশা জ্যোতির কাছে করাটাই

অবাস্তব ব্যাপার। এটা তার স্টাইল নয়। নেমে গিয়ে এবার খেলা উচিত, এই রকম চিন্তা যখন সে নিজে করে তখনই সে পিছিয়ে এসে খেলতে পারে, নয়তো অন্যের নির্দেশে বাধ্য হয়ে খেলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ভেবে-চিন্তে কাজ ঠিক করে নিয়ে সেটা করা তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। অনুভূতির উপর দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারলেই সে গোলমালে পড়ে যায়। পথভ্রষ্টের মত তখন সে নির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়।

ডিফেণ্ডার ও অ্যাটাকারের মধ্যবর্তী স্থানই মিড ফিল্ড খেলোয়াড়ের, তার মধ্যে উভয়েরই সম্মেলন, কোনটিতেই পুরোপুরি এককভাবে নয়। জ্যোতি বরাবরই অ্যাটাকার, তার পক্ষে ডিফেণ্ডার হওয়া অসম্ভব, আবার একই সঙ্গে উভয় ভূমিকা পালনেও সে অপরাগ।

সাধন নাথ তাকে এমন জোরে উল্টো দিকে টেনে দিয়েছে যার ফলে তার খেলাটাই ছিঁড়ে গেছে।

"আমি ওপরে উঠছি" শৈবালকে সে বলল, "বাচ্চুকে নামিয়ে নাও।"

"সাধনদা যা বলেছে তাই কর।" শৈবাল খিঁচিয়ে উঠল।

"আমি খেলতেই পারছি না, এখন গোল দরকার।"

"ভাল করে বল বাড়া।"

"তুমি কি করছ, দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া?"

"সেটা তোর দেখার কথা নয়।"

সাধন নাথ কি ভাববে, তার পরোয়া না করেই মিড ফিল্ডারের কাজ ফেলে দিয়ে জ্যোতি উপরে উঠে গেল।

একতার লেফট ব্যাকের ঘাড়ে অনেক বোঝা, খেলার শেষ দিকে বোঝাটা আরো বাড়ুক এটা তার অভিপ্রেত নয়। জ্যোতি মিড ফিল্ডে থাকায় সে স্বস্তিতে ছিল। এখন তাকে উঠে আসতে দেখে তার মনে হল সারথি এবার আক্রমণ জোরদার করার মতলব নিয়েছে। খেলায় এখনো একটাও গোল হয়নি। জ্যোতিকে অকেজো করার জন্য কিছু একটা না করলে একতা গোল খেয়ে যেতে পারে।

সুযোগ এল। রেফারি তখন অন্য দিকে তাকিয়ে। জ্যোতি একটা ছুটকো বলের দিকে দৌড় শুরু করেছে। লেফট ব্যাক কুড়ুলের মত জ্যোতির পায়ে লাথি কষাল। পড়ে গিয়েও যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে জ্যোতি লাফিয়ে উঠল, ছুটে গিয়ে বলটা ধরল। তার এই কাণ্ডে বিভ্রান্ত লেফট ব্যাক হুড়মুড়িয়ে জ্যোতির ঘাড়ে পড়ল এবং তার ডান পা বুট দিয়ে ইচ্ছে করেই মাড়াল।

www.BanglaBook.org

যন্ত্রণায় অধীর হয়ে জ্যোতি বাঁ পা চালাল লেফট ব্যাকের পায়ের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পেতে। লাথিটা লাগল তার ডান হাঁটুতে। "বাবা রে" বলে লেফট ব্যাক হাঁটু ধরে ঘুরে পড়ল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটল। রেফারি প্রায় পনেরো গজ দূরে। পকেট থেকে লাল কার্ড বার করতে করতে তিনি ছুটে এলেন। কার্ডটা সদর্পে মাথার উপর তুললেন জ্যোতির সামনে দাঁড়িয়ে। সারথির খেলোয়াড়রা ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল। আবেদন, নিবেদন, চোরা খিস্তি, সামান্য ধাক্কা, সব কিছুই রেফারি অগ্রাহ্য করলেন।

"জ্যোতিকেই কিন্তু আগে ফাউল করা হয়েছিল, সেটা তো আপনি···" বাচ্চু প্রতিবাদ করে। তাকে থামিয়ে রেফারি তর্জন করে ওঠেন, "তুমিও কি বাইরে যেতে চাও? এইসব বন্ধ করে এক্ষুনি যদি শুরু না কর তা হলে ম্যাচ অ্যাবানডণ্ড করে দেব।"

মাঠভরা লোকের চোখের সামনে, জ্যোতি মন্থর পায়ে বেরিয়ে আসছে। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন শূন্যে টানা দড়ির ওপর দিয়ে চলা। দর্শকরা শুধু তাকেই এখন দেখছে। জীবনে এই প্রথম তাকে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হল।

ফেন্সিং দরজা পেরিয়ে আসতেই তার চোখ ও কানের ক্ষমতা আবার চালু হয়ে উঠল। সে দেখল গ্যালারির মাঝ দিয়ে তাঁবুতে যাবার সরু পথে ক্রুদ্ধ জটলা। অশ্রাব্য গালিগালাজ উড়ে আসছে।

"এটাকে আর নামায় কেন সাধন নাথ! শেষ হয়ে গেছে তো!"

"নামে কাটছে শালা, একসময় খেলেছে, তাই বলে কি চিরকাল চলবে?"

"ব্যাটা পলিটিক্স করছে। ইচ্ছে করে ডোবাচ্ছে। অরবিন্দ মজুমদারের দলের লোক তো, তাই সাধন নাথকে অপদস্থ করে তাড়াবার জন্য প্ল্যান করে এইসব হচ্ছে।"

"খানকির বাচ্চাটাকে ওই অরবিন্দর সঙ্গেই বিদায় করা উচিত ছিল···ভাবতে পারেন আটটা ম্যাচে এগারো পয়েন্ট!"

"এ বছরও আর চ্যাম্পিয়ন হবার আশা রইল না।"

জ্যোতি জটলায় বাধা পেল।

"এই যে শুওরের বাচ্চা, দুটো ম্যাচ বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করে এলে!"

জ্যোতির মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কতবার ভক্তদের কাঁধে চড়ে সে এই পথ দিয়েই তাঁবুতে ফিরেছে।

কতবার এই পথেই জড়িয়ে ধরার জন্য ভক্তরা কাড়াকাড়ি করত তার পা নিয়ে।

'সারথির সারথি···সারথির সারথি···'

দূর থেকে মেঘ গর্জনের মত গড়িয়ে আসত শব্দগুলো। গ্যালারির দিকে তাকিয়ে সে দু হাত মাথার উপর তুলে নাড়তে।

কবেকার কথা ?

"বাঞ্চোৎ পলিটিক্স এবার বন্ধ কর, নইলে জ্যান্ত চামড়া তুলে নেব।"

থরথর করে উঠল তার সারা শরীর। জটলা ভেদ করে শ্রান্ত নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাবার সময় জ্যোতি পিঠে, পাঁজরে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা পেল। মাথায় থাপ্পড়ের আঘাতটা গরম শিকের মত তার স্নায়ুকেন্দ্রে ঢুকে তাকে এলোমেলো বিপর্যস্ত করে দিল।

জ্যোতি টলতে টলতে নির্জন ড্রেসিং রুমে এসে বেঞ্চে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। অক্ষম নির্দয় ক্রোধ তাকে অবশ করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সে গোঙানির মত একটা শব্দ করে বেঞ্চে মাথা ঠুকতে শুরু করল।

জ্যোতির খুবই পরিচিত একটা আওয়াজ একসময় ড্রেসিং রুমে আছড়ে পড়ল। গোল হল। আওয়াজের বহর থেকে সে বুঝল সারথি গোল করেছে। কিন্তু বিন্দুমাত্র উল্লাস তার মনে জাগল না।

ওরা ফিরে এল। ড্রেসিং রুম মুখর হয়ে উঠল। গোল দিয়েছে শৈবাল। বেঞ্চের একধারে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে জ্যোতি বসে ছিল। শৈবালের হাতটা ধরে সে ঝাঁকুনি দিল। কথা বলল না।

খবরের কাগজের তিন-চারজন লোক ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাদের মধ্যে রঞ্জনও আছে।

"জ্যোতি, এই কি প্রথম রেড কার্ড দেখলি ?" রঞ্জন জানতে চাইল।

"হ্যাঁ।"

"আরে এইটাই তো কালকের খবর।"

"কি রকম লাগল আপনার যখন কার্ডটা দেখাল।" অল্পবয়সী একজন প্রশ্ন করল।

"তোমাকে দেখালে কি রকম লাগত ?"

"রেফারি কি বলল তোমাকে জ্যোতি ?"

"বলল গায়ে বড় গন্ধ যাও চান করে এস।"

"অ্যাঁ !"

www.BanglaBook.org

"বলল চান করে এস।"

"তুমি কি বললে ?"

"বললাম, আসুন গায়ে সাবান ঘষে দেবেন।"

রিপোর্টাররা হেসে উঠল।

"রেফারিং সম্পর্কে তোর কোন বক্তব্য আছে ?" রঞ্জন প্রশ্ন করল।

"আছে, কিন্তু তা ছাপা যাবে না।"

"বলেই ছাখ, ছাপা হয় কি না হয়।"

"মানহানির মামলায় পড়তে চাই না।"

"কি ব্যাপার, এখানে এত ভিড় কিসের। যান, যান, এখন সব যান।"

সাধন নাথ ঢুকল। চোখে-মুখে বিরক্তি।

"আপনারা এখানে কেন ? জ্যোতি, একটা কথাও রিপোর্টারদের বলবে না।"

প্রায় ঠেলেই ওদের বার করে দিয়ে সাধন নাথ দরজা বন্ধ করে দিল।

"আমি কিছুই বলিনি।"

"ভাল, কিছু বলে আর কাজ নেই, এমনিতেই তো যথেষ্ট ক্ষতি করেছ।"

"আমি কি ক্ষতি করলাম ? কি করেছি আমি ?"

সাধন নাথ অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি জান, কি তুমি বলছ ? কি করেছি আমি ? মাঠ থেকে বার করে এনেছ নিজেকে, এটাই তুমি করেছ। নিজেরই মর্যাদা লুটোওনি, ক্লাবেরও মাথা হেঁট করেছ। ভাল কথা, তবে এটাও জেনে রাখ ব্যাপারটা খুব খারাপ হল।"

"আপনি তো দেখেছেন, কিভাবে বল ছেড়ে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রইল।"

"হ্যাঁ দেখেছি, কিন্তু তুমি কি লাথি চালাওনি ?"

"আমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছি। আমাকে পঙ্গু করে ফেলতে চেষ্টা করেছিল।"

"রেফারি তা হলে ওকে কার্ড দেখাল না কেন ?"

"আমি তার কি জানি ? হয়তো টাকা খেয়েছে।"

"হয়তো তুমি রিট্যালিয়েশন আইনটা জান না।

"অমন ঝাড় খেলে আপনি তখন কি করতেন ?

ঘরের সবাই চুপচাপ। দুজনের কথা কাটাকাটিতে ওদের মাথা গলাবার কোন ইচ্ছাই কারুর নেই। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে দু-চারটে কথা নিজেদের মধ্যে বলল। কারুর মুখে বিস্ময়, কারুর চোখে মজা।

"রেফারি কিছু অন্যায় করেনি তোমাকে বার করে দিয়ে।"

"আপনি কার পক্ষ নিচ্ছেন?"

"ঠিক এই প্রশ্নটা আমিও তোমায় করছি। তোমাকে নীচে থেকে খেলতে বলেছি তুমি কেন উপরে উঠে গেলে?"

"খেলা আমাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানেই গেছি।"

"শৈবাল তোমাকে মিড ফিল্ডে থাকতে বলেছিল। তুমি তা অগ্রাহ্য করেছ। আমি দেখেছি ও তোমাকে বলছিল। একলাইনে দুই ইনসাইড চলেছে, একে অপরের সঙ্গে জড়ামড়ি করছে। এ সবই হয়েছে তোমার জন্য।"

"আমি তো বলেই ছিলাম চেষ্টা করব।"

"কিন্তু তা কি করেছ? কি মহৎ ইচ্ছা—চেষ্টা করব। কতক্ষণের জন্য? বড়জোর দশ মিনিট।"

"এভাবে খেলা সম্ভব নয়।"

"এভাবে নয়, বল তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। তুমি পারছ না, পার না। তুমি চাও না। তুমি এমন ভাবে খেলাটা তৈরি করতে চাও যাতে ওপরে উঠে খেলতে পার। কিন্তু জেনে রাখ, সেভাবে আমি খেলাতে রাজি নই। কয়েকটা ম্যাচ তো দেখলাম, তা থেকেই বুঝতে পারছি তোমার মনের মধ্যে কি জিনিস কাজ করছে। হয় তোমার ইচ্ছামত খেলা হোক, নয়তো খেলবেই না।"

"আমার ইচ্ছা যা ছিল তা মরে গেছে।"

"তুমি একটা কোচকে হয়তো ম্যানেজ করেছ কিন্তু আমাকে ম্যানেজ করতে পারবে না। আগে কি ভাবে পার পেয়েছ জানি না, কিন্তু আমার কাছে কোন জারিজুরি চলবে না। আমার মত করে খেলতে হবে নয়তো একদমই নয়।"

"আপনি কি থ্রেট করছেন?"

"যদি তাই মনে কর, তা হলে তাই।"

"কিসের থ্রেট, বসিয়ে দেবেন?"

সাধন নাথ কটমটিয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। জ্যোতি তাকিয়ে দেখল হলঘরে রঞ্জন ও কয়েকজন রিপোর্টার দাঁড়িয়ে।

তার অরবিন্দ মজুমদারকে মনে পড়ল। যদি তিনি এখন থাকতেন! যে-কোন অসুবিধায় বা বিপদে তার কাছে অনায়াসে যাওয়া যেত, কথা বলা যেত মন খুলে। উনি প্লেয়ারদেরই লোক ছিলেন। কখনো বেদীর উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

কথা বলতেন না। সমানে সমানে ছিল ব্যবহার। মন দিয়ে যেভাবে সমস্যার কথা শুনতেন তাতেই ভরসা পাওয়া যেত, স্বস্তি আসত।

অরবিন্দ মজুমদারই সারথিকে ছুটিয়ে টেনে নিয়ে গেছলেন। একজন কোচের পক্ষে যতটা একটা ক্লাবকে তোলা যায়, তা তিনি তুলেছিলেন। এখনো মেম্বাররা অরবিন্দর সফল দিনগুলোর কথা বলে। জ্যোতি আসার কয়েক বছর আগের দিনগুলোকে আজও বলে 'সারথির সোনালী দিন'। ওরা চায় সেই আমলের পুনরাবৃত্তি অবিরত হোক। কিন্তু তাই কি কখনো হয়।

অরবিন্দ মজুমদার চলে গেলেও সারথির ভাবমূর্তি এখনো অবিকৃত রয়েছে। এটা ওঁরই তৈরি করা। লিগে প্রথম চারটি দলের মধ্যে সারথিকে দশ বছর ধরে রেখে গেছেন। 'দৃষ্টিটা সব সময় উপর দিকে নিবদ্ধ রাখবে' এটাই ছিল তাঁর কথা। প্লেয়ারদের ওপর আস্থা রাখতেন, যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাও দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরশ থাকত সব কিছুতেই। খবরের কাগজের লোকেদের সঙ্গে কেউ কথা বললে আপত্তি করতেন না। বিশ্বাস করতেন তাঁর খেলোয়াড়রা এমন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে ক্লাবের সম্মান নষ্ট হয়।

জ্যোতি ভেবে অবাক হল. সাধন নাথ আর অরবিন্দ মজুমদারের মধ্যে পার্থক্য আকাশ থেকে পাতালের অথচ ফুটবল জগতে দুজনের জায়গা একই স্তরে হল কি করে?

যদি বুঝতাম এই রকম দশায় পড়তে হবে তা হলে ট্রান্সফার নিতাম। জ্যোতি টেন্ট থেকে বেরোবার সময়ও চিন্তা করে যাচ্ছিল। পিছনের দরজায় সিঁড়ির পাশে তার মোটরবাইকটা থাকে। বাইরে থেকে দেখা যায় না। এখন ঘুষি মারছে, থুথু ছিটোচ্ছে, খিস্তি করছে, কোনদিন হয়তো বাইকটাকে ওরা জ্বালিয়ে দেবে।

কিন্তু সাধন নাথ ড্রেসিং রুমে সবার সামনে এভাবে তার সঙ্গে ঝগড়া করল কেন? কথাগুলো তো আলাদা ডেকে নিয়ে বলা যেত। নাকি বাইরে দাঁড়ান রিপোর্টারদের কাছে যাতে ঝগড়ার কথাটা পৌঁছে যায় সেজন্য ইচ্ছে করেই সে ঝগড়াটা ঘটাল! এসব খবর পৌঁছে দেবার লোক তো প্লেয়ারদের মধ্যেই আছে। এরপর সাধন নাথ কাগজের লোকেদের কাছে বলতে শুরু করবে, জ্যোতি তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নিয়ে কাজ করছে, জনসাধারণের কাছে ক্লাবকে হেয় করছে। জ্যোতির মনে হচ্ছে, তাকে খুঁচিয়ে উত্যক্ত করে, তার মুখ দিয়ে কথা বার করিয়ে আসলে মেম্বার-সাপোর্টারদের তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়াই বোধহয় সাধন নাথের উদ্দেশ্য।

যারা তাঁবুর বাইরে, রেলিংয়ের ওপার থেকে চিৎকার করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তারা চলে গেছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। ময়দানে বেড়াতে-আসা নর-নারীর ভিড় জমছে। বিকেলের ক্ষিপ্ত, উত্যপ্ত ময়দানে মন্থর প্রশান্তি এবার নেমে আসছে। বাইক ঘুরিয়ে নিয়ে জ্যোতি গঙ্গার দিকে রওনা হল। ভিড় ট্র্যাফিকের মধ্য দিয়ে এখনি মেসে ফেরার ইচ্ছে তার নেই। মাথাটা জুড়িয়ে নেওয়া দরকার। এখন যদি অরবিন্দদা থাকতেন।

সে এলোমেলো কিছুক্ষণ ঘুরল। বাইক থামিয়ে খুব ঝাল দেওয়া আলুচাট খেল। একটু পরে চারটে এগরোল ও দু কাপ আইসক্রীম। ঘণ্টা দুই পর মেসে ফিরে সূর্যর কাছে শুনল খবরের কাগজের একজন লোক তার জন্য ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেছিল। জবেদ আর অজিতের সঙ্গে গল্প করে দুটো ডবল ডিমের মামলেট খেয়ে গেছে।

"আজ নাকি অনেক কাণ্ড হয়েছে মাঠে, তোমার সঙ্গে নাকি কোচের ফাটাফাটি হয়ে গেছে!" সূর্য বলল।

জ্যোতি সচকিত হল। আজকের ব্যাপারগুলো নিয়ে নানান ধরনের রটনা যে হবে, তা সে অনুমান করছে। মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার অপমান ও হেনস্থায় প্লেয়ারদের মধ্যে অনেকেই যে খুশি হয়েছে, সেটা বুঝে নিতে জ্যোতিষী জানার দরকার হয় না।

"কে বলল তোমায়?"

"কে আবার আমায় বলবে, শুনছিলুম বলাবলি হচ্ছিল।"

"ওহ্।" তারপর জ্যোতি বলল, "আমি কিছু খাব না। আর কাল বাড়ি যাব। ক'দিন মেসে থাকব না।"

দুটো ম্যাচ বসে যাওয়া মানে এক সপ্তাহ। কি হবে এখানে বাস করে? বাড়িতে অতদিন থাকাটাও বিরক্তিকর, একঘেয়ে। বরং গোবরডাঙ্গায় বিকাশের বাড়িতে গিয়ে ক'টা দিন কাটিয়ে এলে হয়! ওদের বাগানের ল্যাংড়া আমের স্বাদ সহজে ভোলা যায় না। কিন্তু মুশকিল একটাই, বিকাশের লেখার বাতিকটা। সে নানান ম্যাগাজিনে এক সময় তাকে নিয়ে লিখেছিল 'নতুন তাজা আদর্শ ও রোমাঞ্চের খোঁজে ব্যস্ত আধুনিক যুবমানসের প্রতিভূ জ্যোতি বিশ্বাস।' যে নাকি 'তার প্রজন্মের স্বপ্নকে রূপায়িত করছে তার খেলার মধ্য দিয়ে।'

অন্ধকার ঘরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে জ্যোতির চোখের সামনে ভেসে উঠছে গ্যালারিতে এবং সরু পথটায় দেখা মুখগুলো। কি তীব্র ঘৃণা! এমন

www.BanglaBook.org

ঘৃণার সামনে সে জীবনে কখনো পড়েনি। এ সবই তৈরি হয়েছে তার ক্রমান্বয় ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করেই। বছর বছর প্রতিটি ম্যাচেই তাকে ভাল খেলতে হবে, গোল করতে হবে, এই ওদের ইচ্ছা বা দাবী। গাধা! এইসব নির্বোধদের খুশিতে ডগমগ করে রাখার জন্যই কি সে ফুটবল খেলছে?

কিন্তু একটা সময় গেছে যখন সে ক্লাব অনুগামীদের খুশি করেছে প্রতি ম্যাচে। তখন সে ভাবেওনি, যেদিন তা পারবে না সেদিন কি করবে?

বিকাশ একবার রেডিওর 'যুববাণী' প্রোগ্রামে তার ইন্টারভিউ নিয়েছিল। প্রশ্ন করেছিল, 'যদি আপনি ফুটবল খেলোয়াড় না হতেন তা হলে কি করতেন?' সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিয়েছিল, 'কিছু না'। 'কিছু না'? 'যদি ফুটবল না খেলতাম তা হলে অন্য কিছু করবার ইচ্ছাই আমার হত না।'

এখন তার মনে হচ্ছে একমাত্র টাকা পাওয়া ছাড়া ফুটবল থেকে সে কিছুই পায়নি। নিজেকে তার পরিপূর্ণ ভরাট মনে হচ্ছে না। গভীর আনন্দ জীবনের পাত্রটি থেকে উপচে পড়ছে বা হৃদয়ের অন্তস্থলে আশ্রয় নেবার মত প্রশান্তির কোন ছায়া, কিছুই তার চোখে পড়ছে না। রাস্তার একটা মাস্তানের যে মর্যাদা, তার বেশি আর কিছু নিজেকে সে দিতে পারছে না।

বিপিন স্যারের যে কথাগুলো স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা অহরহ সে করে, ঘুরে ঘুরে সেগুলো তাকে মাকড়সার জালের মত ঘিরে নেয়।

'তোমার সাধনার দ্বারা তুমি কি মানুষকে ভালবাসার পথে, মঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে পেরেছ?'

যে মুখগুলো আজ বিকেলে ঘৃণায় দুমড়ে মুচড়ে গেছল সেগুলো কার সৃষ্টি? স্যারকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে সেদিন বলেছিল, 'যদি মাঠে যান তা হলে দেখতে পাবেন।' কি দেখতে পাবেন? তাঁর ছাত্র, মানুষদের কতখানি শান্তি, সম্প্রীতি, স্পোর্টসম্যানশিপের স্তরে তুলে দিয়েছে?

পরদিন সকালে প্রভাত সংবাদের খেলার পাতায় প্রথমেই দু লাইন, তিন কলাম হেডিংটায় জ্যোতির চোখ আটকে গেল। 'মাঠের ভিতরে লাল কার্ড, মাঠের বাইরে রক্তচক্ষু দেখলেন জ্যোতি'

এরপর স্টাফ রিপোর্টার শুরু করেছে—"সারথির একদা নামী ও দামী স্ট্রাইকার বর্তমানে মিড ফিল্ডার জ্যোতি বিশ্বাস মঙ্গলবার দমদম একতার লেফট ব্যাক সুব্রত বসুকে বিশ্রিভাবে লাথি মারায় রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখান। মরশুমের শুরু

থেকেই ব্যর্থ জ্যোতি যখন মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছেন তখন কিছু সদস্যের হাতে তিনি লাঞ্ছিত হন। খেলার পর ড্রেসিং রুমে কোচ সাধন নাথের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় একসময় প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু সাধন নাথ তা অস্বীকার করে বলেন, 'জ্যোতি এখনো সারথির অ্যাসেট, সব খেলোয়াড়ের জীবনেই ফর্ম হারানোর একটা পালা আসে। মনে হয় ও নিয়মিত প্র্যাকটিস করে ফর্মে ফিরে আসবে।' কিন্তু ক্লাবের এক কর্মকর্তা (নামপ্রকাশে বারণ করেছেন) বললেন, জ্যোতি প্রথম থেকেই সাধন নাথের সঙ্গে অসহযোগিতা করে আসছে। প্র্যাকটিসে সিরিয়াস নয়। তাকে মিড ফিল্ডে খেলানোর জন্য সে কোচের বিরোধিতা করে যাচ্ছে এবং কোচকে ভুল প্রমাণের জন্য নিজের খেলা খেলছে না। ক্লাব কমিটি জ্যোতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবছে।'

"বেশি রাতে সারথির মেসে জ্যোতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। সে মাঠ থেকে তখনো ফেরেনি। তবে কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, টিমের কেউই তার খেলা সম্পর্কে আর ভরসা রাখেন না। একজন তো বললেনই, 'টাকা দিয়ে সাদা হাতি পোষা হচ্ছে। জ্যোতি বিশ্বাস আগের খেলা ভুলে গেছে। এখন হাত পা ছুঁড়ে মাঠে ভয় দেখায়। সারথির পয়েন্টগুলো তো অপোনেন্ট নেয়নি, নিয়েছে জ্যোতি।' আর একজন বললেন, 'এতকাল ওকে যারা মাথায় তুলে নেচে এসেছে এখন তাদের ভুল ভাঙছে। ফুটবল একজনের খেলা নয়।' গোটা সারথি শিবিরই এখন জ্যোতি সম্পর্কে হতাশ এবং সমর্থকরাও।"

এরপর রয়েছে ড্রেসিং রুমে তার সঙ্গে সাধন নাথের কথাবার্তার প্রায় নিখুঁত বিবরণ। এমনভাবে সাজিয়ে লেখা হয়েছে যাতে জ্যোতিকে উদ্ধত ও অবাধ্য বলে মনে হয়। সাফল্যের জন্য সাধন নাথের চেষ্টা যে কত আন্তরিক এবং তা বানচাল করার জন্য জ্যোতির তরফে যে আগ্রহ রয়েছে সেটাও চাপাভাবে বিবরণ থেকে ফুটে উঠেছে।

ঘুলিয়ে উঠল জ্যোতির শরীর। আস্তাকুঁড়ের এঁটোকাটা যেন এতক্ষণ সে চিবোচ্ছিল। কাগজটা হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেয়। তোলার চেষ্টা করল না। 'কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলে'! রঞ্জন কাদের সঙ্গে কথা বলেছে সেটা খোঁজ করে বার করে ফেলা যায়। কিন্তু জেনে কি লাভ হবে? এ ধরনের বলাবলি ইদানীং অনেকেই করে, তার কানেও আসে। অগ্রাহ্য করেছে। এই রিপোর্টও অগ্রাহ্য করবে কিন্তু সারথির হাজার হাজার পাগল সাপোর্টাররা কি এসব অগ্রাহ্য করবে? ছাপার অক্ষরে মিথ্যা কথা বেরোতে পারে না, এটাই তো ওরা বিশ্বাস করে!

www.BanglaBook.org

অবসন্ন লাগছে নিজেকে। চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। নিজের সম্পর্কে তার ভয় হচ্ছে হয়তো তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। জ্যোতির মনের মধ্যে অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা কাতর কণ্ঠের স্বর অতীত থেকে ভেসে আসছে—'আমার কি হবে?' সেদিনও তার এইরকম অবস্থা হয়েছিল। মনে হয়েছিল পাগল হয়ে যাবে। সেদিন সে বাড়ি ছেড়ে, টিটাগড় ছেড়ে পালিয়ে গেছল। এবারও কি তাকে পালাতে হবে? কিন্তু কোথায় যাবে সে?

॥ এগারো ॥

জ্যোতি দু সপ্তাহ মেসে আসেনি। সারথির লোক টিটাগড়ে গিয়ে তাকে পায়নি। দশ দিন আগে সে বাইক রেখেই বেরিয়েছে। বলে গেছে মালদা, কৃষ্ণনগর, গোবরডাঙ্গা হয়ে ফিরবে। বাইকে চলাফেরা আর নিরাপদ নয় ভেবেই সেটা রেখে গেছে। বাংলার গ্রামের দিকে সারথির সাপোর্টাররা একটু বেশিমাত্রায় খবরের কাগজকে বিশ্বাস করে। বাইক আটকে তাকে উত্তপ্ত করে মেজাজ নষ্ট করতে পারে।

বাড়িতে ফিরে খবর পেয়ে জ্যোতি মেসে ফিরল। তার জায়গায় মিড ফিল্ডে অজিতকে আর নতুন একটি ছেলেকে খেলান হয়েছে। চারটি খেলায় আরো এক পয়েন্ট গেছে। তেরো খেলায় মোট ছয় পয়েন্ট হারিয়ে সাধন নাথ এখন চিন্তার মধ্যে। যত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এবং আশা জাগিয়ে শুরু হয়েছিল তার সিকি ভাগও পূরণ হয়নি। সারথি যে'কটা ম্যাচ জিতেছে তাতে খেলা দেখে গ্যালারির দর্শকরা খুশি হয়নি, স্বস্তি পায়নি।

লিগ চ্যাম্পিয়ান কেন, চতুর্থ স্থানে আসার সম্ভাবনাও আর নেই। এখন সমর্থকদের মনে শুধু একটাই বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। যুগের যাত্রীকে হারাতেই হবে।

ড্রেসিং রুমে জ্যোতির সঙ্গে কথা বলায়, গৌতম ছাড়া আর কেউ উৎসাহ দেখাল না। সে লক্ষ্য করল, সবার মধ্যেই কেমন গা-ছাড়া ভাব। দু'দিন পরেই যাত্রীর সঙ্গে খেলা কিন্তু কেউই তাই নিয়ে ভাবছে না। গত বছর যাত্রী তাদের এক গোলে হারিয়েছিল।

"বাচ্চুদার বিয়ে কি সেই মেয়েটার সঙ্গেই ঠিক হল?" গৌতম জানতে চাইল।

"তবে আবার কার সঙ্গে ঠিক হবে!" বিপ্লব বিস্ময় প্রকাশ করল। "সাত

বছর ধরে বাচ্চু লেগে আছে। কম ঝামেলা করেছে মেয়ের বাপ? ফুটবল প্লেয়ারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দেবে না ঠিক করেছিল। সাধনদা, চঞ্চলদা কথা বলে রাজি করিয়েছে।"

"বাচ্চু তো এখনই প্রতিজ্ঞা করেছে, ছেলে হলে কবাডি প্লেয়ার বানাবে তবু ফুটবলার কিছুতেই নয়।"

"ওরে বাবা এখনই ছেলের কথা ভাবছে! আরে আগে বিয়েটা হোক, বৌকে নিয়ে…" বিপ্লব চোখ মারল সারা ঘরের উদ্দেশ্যে।

অরবিন্দ মজুমদারের আমলে ড্রেসিং রুমে এই ধরনের রসিকতা হত না। জ্যোতি মুখ ফিরিয়ে রথীনের দিকে তাকাল। অপ্রতিভ রথীন চেঁচিয়ে উঠল, "আর দেরী নয়, সাধনদা মাঠে চলে গেছে। হারি আপ।"

এই সকালেই মাঠের ফেন্সিংয়ের ধারে, গ্যালারিতে জনা পঞ্চাশ ছেলে প্র্যাকটিস দেখতে এসেছে। তাদের মধ্যে খবরের কাগজেরও একজন রয়েছে। শৈবালের সঙ্গে সে কথা বলছিল পরশুর ম্যাচ সম্পর্কে। পাশ দিয়ে যাবার সময় জ্যোতি শুনতে পেল—"নতুন কি আর বলার আছে। ভাল তো খেলতেই হবে। নিজেদের খেলা খেলতে পারলে ম্যাচ আমরা বার করে দেব।"

জ্যোতির মনে হল শৈবালের কথার মধ্যে আত্মবিশ্বাসটাই যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। নেহাত বলতে হয় তাই বলা। জবেদের মাসল পুল, পরিতোষের জ্বর। ওরা খেলতে পারবে না।

"ওয়ার্ক রেট অনেক কমে গেছে, উন্নতি ঘটাতে হবে।" সাধন নাথ সবাইকে দাঁড় করিয়ে প্রথম কথা বলল। শুক্রবারের ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। না জিততে পারলে জেনে রেখ, গড়ের মাঠে আমাদের আর পা দিতে হবে না, হাড়-গোড়ও আস্ত থাকবে না। আর সব খেলায় হারি বা জিতি তাতে এমন কিছু যায় আসে না, কিন্তু এই ম্যাচটা আমাদের চাই-ই, হাজার হাজার সাপোর্টার তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে…"

সাধন নাথ একটানা বলে যাচ্ছে। জ্যোতি তখন পায়ের বলটা নাড়াচাড়া করছিল। সেটা লক্ষ্য করে সাধন নাথ হঠাৎ কথা বন্ধ করে বলল, "এবার দৌড় শুরু করা যাক। প্রথমে মাঠে কুড়ি পাক তারপর বেরিয়ে রেড রোড ধরে যেমন দৌড়ও।"

জ্যোতি বুঝে গেছে, সাধন নাথের বিশ্বাস ফিটনেসই হল আসল জিনিস। সে ধরেই রেখেছে, বল নিয়ে যা কিছু করার জন্য যে স্কিল দরকার খেলোয়াড়দের মধ্যে

www.BanglaBook.org

সেটা তো থাকবেই। বল কন্ট্রোলের জন্য প্র্যাকটিসকে সে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু মনে করে না। কেউ যদি বলকে আপনা থেকেই কন্ট্রোল করতে না পারে তা হলে তার ফুটবল খেলাই উচিত নয়। আর সব কিছুর মূলে রয়েছে এনডিওরেন্স। গতি না কমিয়ে টানা নব্বই বা সত্তর মিনিট যদি খেলোয়াড়রা দৌড়তে পারে তা হলে ম্যাচ জেতা হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায় শুরুর আগেই। ম্যাচ জিততে না পারলে সাধন নাথ প্রথমেই বলে, 'ট্রেনিংয়ে ঢিলেমি দেওয়ার ফলটা পেলে তো।' তারপর তার প্রিয় ব্যাকটি বলবে, 'ওয়ার্ক রেট আরো বাড়াতে হবে।' কিন্তু কোন খেলোয়াড়ই নিশ্চিত ভাবে জানে না ওয়ার্ক রেট বলতে কি বোঝাতে চাঁয়। তবে এই ধারণাটুকু তাদের হয়েছে যে না-থেমে দৌড়নর সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

একবার দৌড়তে দৌড়তে গৌতম বলেছিল, 'যে রেটে ছোটাচ্ছে তাতে তো ওলিম্পিক ম্যারাথনে কোয়ালিফাই করে যাব!' ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ম্যাচের আগে দু মাইল দৌড়ের পর দু মিনিটের জন্য বিশ্রামের সময় সে বলেছিল, 'শুধুই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব না হয়ে মোহনবাগানের মত অ্যাথলেটিক ক্লাব যদি হতো, তা হলে ফুটবল ম্যাচের বদলে অ্যাথলেটিক কম্পিটিশন করলে আমরা নির্ঘাৎ জিতে যেতাম।'

দৌড়ের পর, পার্টি করে খেলা, তারপর কিছু শুটিং প্র্যাকটিস সেরে ওরা যখন তাঁবুতে ফিরল তখন দাশুদা অপেক্ষা করছে জ্যোতির জন্য।

"যাত্রীর ম্যাচটায় তুই খেলছিস।"

জ্যোতিরও মনে হয়েছিল, তাকে নামতে হবে। সাধন নাথ যতই অনিচ্ছুক থাকুক, তাকে না নামিয়ে আর উপায় নেই। টিম এখন ছন্নছাড়া অবস্থায়, ইনজুরি আর অসুখে আরো কাহিল হয়ে পড়েছে। রিজার্ভে এখন কেউ নেই যাকে এই ম্যাচে নামান যায়।

"মিড ফিল্ডে খেলতে হবে?"

"হবে! যা বলছে তাই কর।"

"দাশুদা অনেকবার বলেছি, আমাকে আমার জায়গায় খেলতে দিন। ব্যাণ্টাস ওয়েটকে যদি বলেন, এখন থেকে তুমি হেভিওয়েট তা হলেই কি সে হেভিওয়েট হয়ে যাবে?"

"তোর যা ট্যালেণ্ট তাতে তুই সব জায়গায় খেলতে পারিস।"

"হ্যাঁ এই ট্যালেণ্টটাই এখন সাধন নাথের দরকার।"

"যাক ওসব কথা, আজ সন্ধেবেলায় আসছিস?"

অর্থাৎ ওর ফ্লাটে। বীয়ার খাওয়ার বা ব্লু ফিল্ম দেখার জন্য?

"না, সময় নেই।"

জ্যোতি দ্রুত স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল।

এত লোক খেলা দেখতে আসবে জ্যোতি তা ভাবেনি। সবুজ গ্যালারিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। যাত্রীর আর সারথির পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে গ্যালারিতে অন্যান্য বছরের থেকে এবারের টেনশন অনেক বেশি। দুটি দলেরই সমান খেলায় সমান পয়েন্ট। তৃতীয় স্থানের জন্য লড়াই এবং আজকের খেলাতেই সেটা স্থির হয়ে যাবে।

সারথির ড্রেসিং রুমেও টেনশন। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। সাধন নাথ থমথমে মুখ নিয়ে নিজের ঘরে। মাঠের গুঞ্জন ঘরে আসছে। শৈবাল জানলা বন্ধ করে দিল। জবেদ উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিল।

"খুললি কেন?"

"গরম লাগছে।"

"লাগুক।" শৈবাল শব্দ করে পাল্লা বন্ধ করল।

"না, খোলা থাকবে।" জবেদকে হঠাৎ হিংস্র দেখাল।

জ্যোতি চুপ করে হোজ পরতে পরতে দেখছে দু'জনের ব্যাপারটা। টেনশনের প্রকাশ এভাবেই ঘটে। সে নিজেও শান্ত নেই। একটা ঝাঁঝালো অবস্থা তার মধ্যেও তৈরি হচ্ছে।

পাশ থেকে অজিত বিড়বিড় করল, "আমাকে রাখতে হবে ওদের লেফট উইংটাকে। নতুন ছেলে, খুব ফাস্ট। ...সাধনদা বলেছে না পারলে মাঠের বাইরে চালান করতে।"

"মারবি?"

"তা ছাড়া আর কি করব।" অজিত মাথা নীচু করে বুটে ফিতে পরাতে লাগল।

হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ ভেসে এল। একটু পরেই ঘরে ঢুকল চঞ্চল মৈত্র।

"সবুজ গ্যালারিতে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। বোতল, ইট চলছে, সারথি সাপোর্টার কয়েকজনের মাথা ফেটেছে। ওর বদলা চাই।" চঞ্চল দু হাত ঝাঁকিয়ে প্রায় উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল। "এর শোধ তোরা নিবি। আমাদের লোক মার খাচ্ছে, তোরা যদি মানুষের বাচ্চা হোস, যদি মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস তা হলে আজ জিতে ফিরে আসবি।"

www.BanglaBook.org

সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। জ্যোতির গলা শুকিয়ে আসছে। থরথর করে হাতের আঙুল কেঁপে উঠল। ম্যাচ শুরুর আগেই মারামারি, রক্তারক্তি। এটা ভাল লক্ষণ নয়। সারা মাঠ যে কি টেনশনে রয়েছে, তারই প্রমাণ এইসব।

ম্যাচে জিততেই হবে। নরখাদক বাঘ গুড়ি মেরে অপেক্ষায় রয়েছে সারা মাঠ ঘিরে। তীক্ষ্ণ নজরে তার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করে যাবে।

আগের ম্যাচের কথা মনে পড়ল তার। জ্যোতি বিশ্বাস ইচ্ছে করে ক্লাবকে ডোবাচ্ছে,...পলিটিক্স করছে...ক্লাব সাদা হাতি পুষছে...যারা মাথায় তুলে নেচেছে এখন ভুল ভাঙছে তাদের...নিজের খেলা খেলছে না,...জ্যান্ত চামড়া তুলে নেব।

তার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে সে দু-তিন মিনিটের বেশি আর দৌড়তে পারবে না। পা দুটো ভারী লাগছে। শট নেবার জন্য পা বোধহয় তুলতে পারবে না।

কে একজন এসে কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিল। কিন্তু কালিঘাটের কালী কি এখন তার ঝাপসা চোখ পরিষ্কার করে দিতে পারবেন? সে কিছুই তো দেখতে পারছে না।

"সবাই রেডি।" সাধন নাথ দরজায় এসে দাঁড়াল। "যা বলার তাতো বলেই দিয়েছি। মাঠে আজ দারুণ টেনশন। তোমরা রিল্যাকসড থেকে খেলে যাও।"

তাঁবু থেকে সবার সঙ্গে বেরিয়ে জ্যোতি মাঠের দিকে এগোল। সারথিকে দেখামাত্র ক্র্যাকার ফাটিয়ে অর্ধেক মাঠ গর্জন করে উঠতেই তার চটকাটা ভাঙল। হঠাৎই বুকটা তার কেঁপে উঠল। এই গর্জনটায় সে অভ্যস্ত, তাকে মধুর উত্তেজনায় ভরিয়ে দেয় এই বিশাল ধ্বনিপুঞ্জ। সে জানে এই গর্জন তার জন্যই, বিরাট প্রত্যাশা লুকিয়ে থাকে এর আড়ালে যেটা ঝলসে ওঠে তার কাছ থেকে গোল পাবার পর।

কিন্তু এখন সে ভয় পেল। এই গর্জন তাকে স্বাগত জানাতে হয়নি। আহত ক্রুদ্ধ একটা নরখাদক শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে যে গর্জন করে, এটা তাই।

"ভগবান, আজ যেন খেলতে পারি।"

মনে মনে জ্যোতি বলল এবং জীবনে এই প্রথমবার। ভগবানে বিশ্বাস তার কখনো ছিল না। অরবিন্দদার একটা কথা মনে পড়ছে তার। 'যেভাবে খেললে তুই স্বচ্ছন্দ বোধ করবি, সেই ভাবেই খেলবি। আর কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবি না।'

কিন্তু চারপাশে এখন কি হচ্ছে? কিভাবে স্বচ্ছন্দ বোধ করব? আমাকে সাধন নাথ চেপে, কুঁকড়ে, পিষে দিয়েছে। কোথায় আমার স্বাধীনতা? কোথায় আমার গতি? এসপার-ওসপার মনোভাব? হঠাৎ ঝলসানি দেওয়ার ইচ্ছা? মনের সঙ্গে তাল রেখে শরীর কেন আর চলে না?

রাগে ক্ষেপে উঠছে। জ্যোতির এবার চোয়াল শক্ত হল। রগের কাছটায় টিপটিপে ব্যথা জমছে। সাধম নাথের মুখের দিকে সে তাকাল মাঠকে প্রণাম করে নামার আগে। এই লোকটা কিংবা এই গর্জন কিংবা এই বেইমান সাপোর্টাররা সবাইকে সে শিক্ষা দেবে। বুঝিয়ে দেবে জ্যোতি বিশ্বাস মরে যায়নি।

খেলা দু মিনিট না গড়াতেই জ্যোতি বুঝে গেল আজ সে পাহারায় রয়েছে। যাত্রীর অসিত আজ তাকে খেলতে দেবে না। নিশ্চয় কোচের নির্দেশেই সে জ্যোতির দু গজের বাইরে নিজেকে রাখছে না। অসিত ঝগড়া করে সারথি ছেড়ে গেছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জেদ তাকে ক্ষেপিয়ে রেখেছে। জ্যোতিকে অকেজো করার দায় তার উপরই পড়েছে এবং অসিত তাতে অখুশি নয়।

আজ ফরোয়ার্ডদের খেলানোর দায়িত্ব, আক্রমণ তৈরি করে দেওয়ার কাজ জ্যোতির। প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেল অসিত তাকে বল ছুঁতে দেয়নি। ছায়ার মত সঙ্গে লেগে রয়েছে।

গ্যালারিতে যাত্রীর গর্জন আর সারথির হতাশা খেলার মাঠ ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে। শৈবাল খিঁচিয়ে হাত নেড়ে জ্যোতিকে গালাগাল দিল। জ্যোতি না শোনার ভাণ করল।

অবশেষে পিছন থেকে পাওয়া একটা বল সেন্টার লাইনের কাছে ধরে সে অসিতকে টলিয়ে দু পা এগোতেই অসিত তাকে ট্রিপ করে ফেলে দিল। নিজেই ফ্রি কিক নিয়ে ডান দিকে বিষ্ণুকে দিয়ে, বলটা ফেরত পাবার আশায় সে সামনে দৌড়ল, পাশাপাশি অসিতও। বিষ্ণু উঁচু ক্রস পাঠাল, বলটা মাথায় নেবার জন্য জ্যোতি লাফাতেই অসিত কনুই দিয়ে পাঁজরে মারল। বুক চেপে সে বসে পড়ামাত্র যাত্রীর স্টপার বলটা পেয়ে মাঝ মাঠে পাঠাল।

"আমাকে টাইট মার্কিংয়ে রেখেছে···কি করব···মূর্তিকে আমার পাশে খেলতে বল।" জ্যোতি ছুটে গিয়ে শৈবালকে বলল।

"সাধনদা যা বলে দিয়েছে···তুই যেভাবে পারিস চালিয়ে যা। আর একটু নেমে খেল।"

জ্যোতি আরো তিনবার বল ধরে এগোন মাত্র অসিত তাকে ফেলে দিল। রেফারি দুবার তাকে হুঁশিয়ার করে অবশেষে অসিতকে হলুদ কার্ড দেখালেন।

www.BanglaBook.org

গ্যালারিতে চিৎকার, বিদ্রূপ এবং গালিগালাজ শুরু হল। বল সাইডলাইনের বাইরে যাওয়ায় থ্রো ইনের জন্য বলটা কুড়োতে গিয়ে জ্যোতির চোখ দর্শকদের উপর পড়ল। খালি গায়ে, দু হাত ঝাঁকিয়ে উন্মাদের মত চাহনি নিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে। ঠোঁটের কষে গ্যাঁজলা। এক কিশোর টলতে টলতে ছুটে গ্যালারির ভিড় ঠেলে নেমে এসে কাঠের বেড়ায় কপাল ঠুকতে লাগল। বলটা কুড়িয়ে সে একবার পিছনে তাকাল। কপাল থেকে রক্ত ঝরছে।

হাফ টাইমে খেলা গোলশূন্য।

"হয় আমাকে বসিয়ে দিন নয়তো অন্য কোথাও খেলান।"

সাধন নাথ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন জ্যোতির দিকে।

"অসিতকে তুমি ছাড়াতে পারছ না, এটা আমায় বিশ্বাস করতে হবে? তোমার নখের যুগ্যি ও নয়।"

"আপনি বলতে চান অসিত কোন প্লেয়ারই নয়, ও খেলতেই জানে না?"

"অসিত তোমার খেলা নষ্ট করছে, কেন, তুমি কি ওর খেলাটা নষ্ট করতে পার না? আসলে তুমি চেষ্টাই করছ না। শুনেছ, গ্যালারিতে কি বলছে তোমার সম্পর্কে?"

জ্যোতির স্নায়ু এবং হৃদপিণ্ড একই সঙ্গে ঝাঁকুনি খেল। পেশিগুলো টানটান হয়ে উঠল। মাথা নীচু করে বসে রইল মাঠে নামা পর্যন্ত।

অসিত প্রথমার্ধের মত একইভাবে তাকে পাহারা দিতে লাগল। সে নিজে খেলছে না, জ্যোতিকেও খেলতে দিচ্ছে না এবং সারথির সমন্বয় বা সংগঠন এর ফলে ক্রমশ বাঁধন ছেঁড়া এলোমেলো হতে শুরু করল। ম্যাচটা যাত্রীর মুঠোয় ধীরে ধীরে এসে গেছে। পেনাল্টি এলাকায় অবিরাম চাপ তৈরি হচ্ছে। যে-কোন সময় সারথি গোল খেয়ে যেতে পারে।

যাত্রীর সমর্থকদের উল্লাস এবং রণহুঙ্কার একটানা বয়ে চলেছে। সারথির ডিফেন্স তছনছ। আটজনে উঠে এসে ওরা ঘিরে ধরেছে, নয়জনে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। ঠিক এই সময় জবেদের একটা ক্লিয়ারেন্স ছিটকে সোজা এল বাঁদিকে জ্যোতির পায়ে। অসিত একটু দূরে। যাত্রীর গোল প্রায় ষাট গজ দূরে। সামনে বাধা শুধু একজন স্টপার।

বল নিয়ে জ্যোতি দৌড়ল। কয়েক মুহূর্তের জন্য গ্যালারি নিস্তব্ধ রইল অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জ্যোতি মোক্ষম মারণাস্ত্রের মত নিখুঁত। কি হতে যাচ্ছে বুঝে উঠতেই সারথি সমর্থকরা কলেজ ফাটানো চীৎকার করে উঠল।

অসিত তাকে তাড়া করেছে। স্টপার বুঝতে পারছে না চ্যালেঞ্জ দিয়ে এগোবে, না আর একটু পিছিয়ে ট্যাকলে যাবে। সে হাফ লাইনের কাছে জ্যোতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরি হয়ে রইল।

কাছাকাছি হয়ে জ্যোতি ডজ করার ঝুঁকি আর নিল না। বলটা স্টপারের পাশ দিয়ে ঠেলে দিয়েই তাকে পাশ কাটিয়ে সে বেরোতে বোরোতে দেখল সামনে শুধু গোলকিপার। অবধারিত গোল হচ্ছে জেনে গ্যালারিতে ক্র্যাকার ফাটল।

জ্যোতি বলটাকে আবার দখলে আনতে পায়ে সবেমাত্র ছুঁয়েছে সেই সময় অসিত পিছন থেকে শেষ চেষ্টা করল তার পায়ের গোছে লাথি মেরে। হুমড়ি খেয়ে জ্যোতি মুখ থুবড়ে পড়ল এবং অদ্ভুত এক ব্যাপার করে বসল। লাফ দিয়ে উঠে বলটা আবার আয়ত্বে আনার বদলে সে ছুটে গিয়ে জমিতে পড়ে-থাকা অসিতের বুকে লাথি কষাল।

সারা মাঠ স্তম্ভিত। ছুটে এল দু দলের কয়েকজন ঘুঁষি তুলে। তাদের বাধা দিতে ছুটে এল কয়েকজন। জটলা এবং ধস্তাধস্তির মধ্যে রেফারি লাল কার্ড তুলে দু'জনকে দেখালেন।

এই সময়ই দেখা গেল গ্যালারির একদিকে কি যেন ঘটছে। পরপর তিনটে ক্র্যাকার ফাটল। একদল লোক দিশেহারা হয়ে হুড়মুড় করে নীচে নেমে আসছে। খালি গায়ে ঝাকড়া চুল একজন একটা ছুরি হাতে এলোপাথাড়ি ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। গ্যালারির ওইদিকের অংশটা দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে। মাটিতে গাদাগাদি, ভয়ার্ত চিৎকার। সবাই দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করছে।

মাঠে খেলা শুরু হয়ে গেছে। শেষ হতে ছয় মিনিট তখনো বাকি। দেখা গেল, গ্যালারি ও মাঠের মাঝখানে কাঠের বেড়ার উপরের কাঁটাতার টেনে নামিয়ে ফেলছে কয়েকজন লোক। কয়েকটা দেহ বেড়ার ওধার থেকে ধরাধরি করে নামিয়ে দেওয়া হল মাঠের ধারে। পুলিশ ঢাল আর ব্যাটন নিয়ে গ্যালারিতে উঠে এলোমেলো পিটোতে শুরু করেছে।

শেষ হুইশল বাজার আগেই জ্যোতি তাঁবুতে চলে এলেছিল। আজ সে ফেরার সময় কোন জনতার সামনে পড়ল না। ড্রেসিং রুমে সে একাই বসেছিল। দেয়ালে ঠেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করে সে ঘটানাটা মনে মনে আবার তৈরি করার চেষ্টা করছিল।

বাইরে ক্লাবলনে কিছু একটা হচ্ছে মনে হওয়ায় সে জানলা খুলে তাকাল এবং বিমূঢ় হয়ে গেল। রেলিংয়ের ধারে শত শত মানুষ নির্বাক দাঁড়িয়ে। সাত-

www.BanglaBook.org

আটটি দেহ লনের উপর শোয়ান। আরো দেহ কাঁধে, ঘাড়ে, পাঁজাকোলা করে আনা হচ্ছে। দেহগুলির দিকে আর একবার তাকিয়ে জ্যোতির বুঝতে অসুবিধা হল না সেগুলিতে প্রাণ নেই।

ধীরে ধীরে জ্যোতির চেতনা থেকে আলো সরে গিয়ে অন্ধকার নেমে এল। অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পড়ে যাবার আগে সে শুধু বলেছিল, "ভগবান, আমার জন্যই..."

॥ বারো ॥

এগারো জন মারা গেছে।

কেউ পায়ের চাপে, কেউ বেড়ায় বা বন্ধ দরজায় ভিড়ের চপে পিষে, দম-বন্ধ হয়ে। মৃতরা পালাতে চেয়ে দিগভ্রান্তের মত সরু পথ দিয়ে দরজার দিকে ছুটেছিল বেরোবার জন্য। কাঠের দরজার খিল খোলার আগেই তারা ভিড়ের চাপে পড়ে যায়। ওরা ভয় পেয়ে হঠাৎই একসঙ্গে ছুটেছিল।

ভয় জ্যোতিও পেয়েছিল। দিনের পর দিন সে নিজের খেলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তার ভয় হচ্ছিল নিজের ফুটবল জীবনেকে সে হারিয়ে ফেলছে। চারিদিক থেকে পরিস্থিতিগুলো তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তাকে ঘিরে দম-বন্ধ-করা একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সে বাঁচার জন্য খেলার মধ্যে আসতে চেয়েছিল। ফুটবলের বাইরে তার জীবনের কোন অর্থ নেই। ছোটবেলা থেকে এটাই সে জেনে এসেছে।

অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে অনেকেই তাদের গাড়িতে অসাড় দেহগুলোকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, সরকারীভাবে মৃত ঘোষণার জন্য। তাঁবুর মধ্যে শ্মশানের মুহ্যমানতা। যাত্রীর খেলোয়াড়রাও নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যায়নি। বড় হল ঘরে তারা সারথির খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসে। তাঁবুর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা।

এখন কি কথা যে বলবে ওরা ভেবে পাচ্ছে না। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। সান্ত্বনা দেবার জন্য কাউকে ওরা পাচ্ছে না, সান্ত্বনা নেবার ইচ্ছাও যেন ওদের নেই। প্রত্যেকেই নিজেকে অপরাধী ভাবছে।

হঠাৎ কে একজন অস্ফুটে বলল, "পড়ে গিয়ে উঠল, তখনো চেষ্টা করলে বলটা কণ্ট্রোলে নিতে পারত।"

কেউ কথা বলল না। শুধু জ্যোতির মাথাটা নীচু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে তার মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হয়েছে। ভিজে চুল থেকে টপটপ জল পড়ল কোলে।

হয়তো ঠিকই বলেছে। বলটা আবার সে দখলে এনে গোলের দিকে এগিয়ে যেতে পারত। শুধু গোলকিপার ছাড়া তো সামনে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তা না করে সে অসিতের দিকে ছুটে গেল। কেন? সারা জীবন তাকে এর উত্তর খুঁজতে হবে এবং উত্তর পাবে না।

জীবনে অনেক ব্যাপারেরই উত্তর পাওয়া যায় না। তবু খোঁজাখুঁজি চলে। এগারোটা প্রাণ চলে গেল। জ্যোতি বুঝে উঠতে পারছে না, কেন গেল? তার ওই লাথিটাই কি দায়ী? লাথি মারা দেখেই কি গ্যালারিতে তাণ্ডব শুরু হল? সবাই তাই বলবে।

কিন্তু এই খেলাটার মাধ্যেই কি হিংস্রতার বীজ নেই? সেটাকেই চমৎকারভাবে বার করে আনার, বাড়িয়ে তোলার জন্য কি লিগ আর টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়নি? ম্যাচ জেতাটাই বড় কথা আর সেজন্যই চাই গোল। খেলোয়াড়রাই নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ চায় জিততে। যে-কোন পন্থায়।

আমিই কি শুধু দায়ী? যারা মারা গেল তারাও এসেছিল জয় দেখতে। তারা কোন্ দলের সমর্থক জ্যোতি তা জানে না, কিন্তু ভয় না পেলে ওরা হয়তো এখন জীবন্ত থাকত।

এটাকে ভয় বলা যায় কি, না শোভনতা, রুচি, শান্তি রক্ষার জন্য চেষ্টারই একটা প্রকাশ। ভয়ের বদলে ওরাও তো আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র হয়ে উঠতে পারত! জীবনের ভাল দিকটা ওরা দেখাতে চেয়েছিল কি? আর আমিই সেটা ধ্বংস করলাম। কাকে যেন বলেছিলাম, হাজার হাজার মানুষকে আমি খেলার মধ্য দিয়ে আনন্দ দিই? দুঃখকষ্টের জীবন থেকে মুক্তি দিই?

"জ্যোতি আর এখানে নয়, আমার সঙ্গে চল।"

চোখ তুলে সে দাশুদার ঝুঁকে পড়া মুখটার দিকে তাকাল। নির্বাক অর্থহীন চাহনি তার। যাত্রীর লোকেরা নিঃশব্দে কখন নিজেদের তাঁবুতে চলে গেছে।

"কাগজের লোকেরা তোকে ধরার জন্য দাঁড়িয়ে। তোর স্টেটমেন্ট চায়। বলেছি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে, শুয়ে আছে ট্রাঙ্কুইলাইজার খেয়ে। টুক করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমার গাড়িতে গিয়ে বোস।"

"আমি কথা বলব।"

"না।" দাঁতে দাঁত চেপে দাশুদা গজরে উঠল। "একটি কথাও নয়। এই মুহূর্তে তোর একটা বেফাঁস কথায় সারথির সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

www.BanglaBook.org

"আমি নিজের কথা বলব, সারথিকে কোন কিছুতেই টানব না। দাশুদা প্লিজ..."

"চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা। তুই এখনো সারথির প্লেয়ার, এখনো তোর গায়ে সারথির জার্সি। যা বলবি সেটা ক্লাবেরই কথা হয়ে যাবে। আর নিজের কথা তোর কি-ই বা বলার আছে, কি সাফাই গাইবি? রাস্তায় বেরোতে পারবি? লোকে খুনী বলবে তোকে।"

"ওরা ভুল, মিথ্যে কথা লিখবে।"

"লিখুক, যা খুশি লিখুক। দু-চারদিন লোকে মনে রাখবে, তারপর ভুলে যাবে। তুই বেরিয়ে গিয়ে বোস গাড়িতে। বুট, হোজ এগুলো খুলে ফেল, এই লুঙ্গিটা পর আর গামছাটা গায়ে মাথায় জড়িয়ে নে।"

"আমার মোটরবাইকটা..."

"থাকুক এখানে। চাবিটা দে, কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেব। এখন তোর বাইক চাপা উচিত নয়।"

"কোথায় যাব?"

"আমার ওখানে আপাতত। তোকে খুঁজতে মেসে যাবেই, হয়তো টিটাগড়ও যাবে।"

জ্যোতি নির্বিঘ্নেই রাস্তায় বেরিয়ে এল। অন্য দিনের মতই রাস্তা। স্বাভাবিক, ব্যস্ত, আমুদে। ফুটবল মাঠের দর্শকরা বিস্ময় আর বিষাদ নিয়ে ফিরে গেছে। গঙ্গার দিকের আকাশে সূর্যাস্তের রূপ ধরছে। তাই দেখে জ্যোতির মনে গভীরতা স্পর্শ করল।

দাশুদার ফ্ল্যাটে অন্ধকার ঘরে সে শুয়ে। ছবির মত চোখের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, সকাল থেকে সারা দিনটা। একসময় নীচে মোটরবাইকের শব্দ হল। তার বুলেট ফিরে এল। দরজায় বেল বাজাল। দুজনের কথা হচ্ছে। একটু পরে নান্টু ঘরে ঢুকল।

"জ্যোতিদা, তোমার জামা-প্যান্ট আর চাবিটা রইল।"

সে জবাব দিল না। নান্টু বেরিয়ে গেল। রাতে সে আধ-ঘুম, আধ-জাগরণের মধ্যে এপাশ-ওপাশ করে একসময় উঠে পড়ল। ঘড়িতে দেখল চারটে বাজে। নান্টু সোফায় ঘুমোচ্ছে, মেঝেয় একটা গল্পের বই পড়ে, আলো জ্বলছে।

আধঘণ্টা পর সে নিঃসাড়ে বেরোল ফ্ল্যাটের দরজা খুলে। অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে গেটে। নাইট গার্ড জেগেই ছিল। তাকে সে চেনে।

"বাহাদুর, গেটটা খুলে দাও।"

"এখনো তো আঁধার রয়েছে!"

"হ্যাঁ, এই সময়টায় বেড়াতে খুব ভাল লাগে।"

খোলা গেট দিয়ে বুলেটটা বেরিয়ে এসে ছুটল হাওড়া ব্রিজের দিকে। গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়া ময়দান থেকে বাঁদিকে ঘুরল। শিবপুর হয়ে একসময় বোম্বে রোড ধরে জ্যোতির বাইক ছুটল পশ্চিমে রূপনারায়ণ নদীর দিকে।

॥ তেরো ॥

গর্ত আর ঢিবিতে বাইক নিয়ন্ত্রণে রাখা ক্রমশই বিরক্তকর হয়ে পড়ছে। খালি গা, ইজের পরা ছেলেটি বলে দিল এই কাঁচা রাস্তাটা ধরে আরো দশ মিনিট যেতে হবে। দূরে বড় বড় গাছের আড়ালেই রয়েছে রাজপুর। ছেলেটি অরবিন্দ মজুমদারের নাম শোনেনি। পানিত্রাসের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করতে করতে অবশেষে এই পর্যন্ত পৌঁছেছে। বছর চারেক আগে শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখতে এসেছিল। সেই পর্যন্ত পথ তার চেনাই ছিল।

পথের অবস্থার জন্য বাধ্য হয়েছে বটে কিন্তু তা না হলেও জ্যোতি বাইকের গতি মন্থর করত। সকালের গ্রাম, দু'পাশের সবুজ ধানক্ষেত, রোদের মৃদু তাত, আকাশে চিল, মাটি, জল, কাদা, লতাগুল্ম, গাছ, শস্য এবং বাতাস দ্বারা তৈরি অলৌকিক সোঁদা গন্ধ আর নির্জনতা এবং নৈঃশব্দ্য, এসব চেখে নিতে হলে ব্যস্ততা বর্জন দরকার।

কোনদিকে যে তাকাবে সে ঠিক করে উঠতে পারছে না। সূর্য ডান দিকে দূরের গাছ ছাড়িয়ে উঠেছে। বাঁ দিকে ডোবায় জাল ফেলছে গেরস্থ। ছুটে আসছে এক বালক মোটরবাইকটাকে কাছ থেকে দেখবে বলে। দুধ দোওয়া বন্ধ রেখে বৌটি মুখ ঘুরিয়ে, দেখছে, গরুটি চেটে যাচ্ছে তার বাছুরকে। দুটো বুলবুলি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করছে নিমগাছটায়।

হঠাৎ জ্যোতির মনে হল কে যেন তাকে ডাকছে। বাইক থামিয়ে সে মুখ ফেরাল। দুশো গজ দূরে একটা ডোবার পাশে, জড়াজড়ি করা কয়েকটা খেজুর গাছের ধারে দুটি লোক। তাদেরই একজন হাত তুলে নাড়ছে আর চেঁচাচ্ছে।

"জ্যোওওতিইই···অ্যাই জ্যোওওতি···"

অরবিন্দদা! জ্যোতি দু'হাত তুলল, গোল দিয়ে যে রকম ভাবে তুলত। আশ্চর্য, যত দূরেই হোক অরবিন্দদাকে সে চিনতেই পারেনি অথচ খেজুর গাছগুলোর ওপর থেকে তার চোখ ঘুরে এসেছে।

www.BanglaBook.org

আসমান জমি আর আলের উপর দিয়ে অরবিন্দ মজুমদার ছুটে আসছেন। গেঞ্জি আর হাঁটু পর্যন্ত গোটান ধুতি। ফুটবলারের মত অভ্যস্ত সুঠাম দৌড়।

"দূর থেকে আওয়াজ পেয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। তারপর দেখি কিন্তু তুই!"

"আমি কিন্তু চিনতেই পারিনি। এখানে কি করছেন?"

"আগে বল তুই যে এখানে?"

"পালিয়ে এলাম।"

"কি করেছিস?"

"কাগজ আসুক জানতে পারবেন।"

"খবরের কাগজ এখানে আসে না," অরবিন্দ মজুমদার হাসলেন। "এলেও আমি পড়ব না।"

জ্যোতি অপ্রতিভ হল। কাগজের কথা তোলাটা উচিত হয়নি।

"এখানে একটা জমিতে ধান দিয়েছি। পোকা লেগেছে, কাল ওষুধ দিয়ে গেছলাম, দেখতে এসেছি। তোর ব্যাপার কি? কিছু হয়েছে নাকি? এখনো তো লিগ চলছে আর তুই···ক্লাবের সঙ্গে কিছু?"

"আমি অনেক কিছুই জানি না অরবিন্দদা। আমি হেরে যাচ্ছি।" বাইকের দু'পাশে পা, দুটো হাত হ্যাণ্ডেলে, কাতর স্বরে জ্যোতি রাজপুরের রাস্তায় কথাগুলো বলল।

অরবিন্দ মজুমদার বুঝে উঠতে পারলেন না। তাকিয়ে রইলেন।

"আমি ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে। যা হতে চেয়েছিলাম তা হতে পারলাম না। ফুটবলকে সাধনার জিনিস করতে পারলাম না। মানুষকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই, এটা কাল আমি জেনেছি। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমি পালিয়ে এসেছি।"

ধীরে ধীরে অরবিন্দ মজুমদারের মুখে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল। মাথা নাড়লেন আক্ষেপে। "এই রকমই হয়। বড় বেশি আঁকড়ে ধরেছিলিস কিনা। ক'দিন এখানে থেকে যা। চল বাড়িতে যাই, আজ তোর বাইকে উঠব।"

"বৌদি কেমন আছেন?"

"খুব ভাল।" বলতে বলতে তিনি বাইকের পিছনে বসে দু'হাতে জ্যোতির কাঁধ ধরলেন। বাইক চলতে শুরু করার পর বললেন, "জ্যোতি, ফুটবলটা জীবনের একটা সামান্য অংশমাত্র। এত ভেঙে পড়ছিস কেন? নিজের মত করে কি জীবনটাকে খেলাতে পারিস না?"

"না, পারি না। জীবনটা যে কত বিশাল সে ধারণাই আমার নেই।"

"আমারও নেই, কিন্তু তাতে কি এসে যায়! যেমন যেমন জানছি তেমন তেমন করে চলি। তোর মত হতাশা আমারও এসেছিল। তাই আমি ভেতরে ভেতরে আলগা হয়ে গেছলুম, কোচিং করা আর আমার ভাল লাগত না। টিম হেরে গেলে আগে প্লেয়ারদের পাশে দাঁড়াতুম, সান্ত্বনা দিতুম, সহানুভূতি জানাতুম, ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিতুম। তুই নিজেও তো দেখেছিস আমায়। কিন্তু পরে বিরক্ত হয়ে মুখ দিয়ে যা-তা কথা বেরোত। এইসব গাধাদের পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না, এমন কথাও বলেছি। তাই তো আমার বিরুদ্ধে অনেকেই চটে যায়। তাদের অনেকের মন্তব্য কাগজেও বেরোয়।"

"হ্যাঁ জানি সেসব, পড়েছিও।"

"টানা সাফল্য ফুটবলে কখনো চিরকাল থাকে না। জীবনেও তেমন হয় না। তুই লক্ষ্য কর পৃথিবীর বড় বড় ক্লাবগুলোকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, কি রিয়্যাল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান, টটেনহাম হস্পার কিংবা বেয়ার্ণ মিউনিখ। এরা এক এক সময় উঠেছে, পড়েছে, আবার উঠেছে। এই ওঠা-পড়ার পিছনে কতকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছে। কোচ, প্লেয়ার, ম্যানেজমেন্ট, সাপোর্টার সব মিলিয়ে ক্লিক করে গেলেই ওঠা। সারথিও এই কারণে উঠেছিল। সাফল্যই আবার পতনের কারণগুলো তৈরি করল। এটা অবধারিত ছিল। আমি শুধু অপেক্ষা করছিলুম কবে, কবে এটা আসবে। তারপর গত বছর থেকেই দেখলুম পতন শুরু হচ্ছে।"

"আমায় তো কখনো বলেন নি!"

"ইচ্ছে করেই বলিনি। আমি চেয়েছিলুম তুই ঠেকে শেখ্। ফুটবলার হিসেবে তোর যা দেবার তা তুই দিয়ে ফেলেছিস। এখন তুই দেখছিস কিছুই ফিরে পাসনি।"

জ্যোতি মাথা নাড়ল। "না অরবিন্দদা, কিছুই পেলাম না।"

"কেন, টাকা পয়সা, নাম যশ? এগুলো কি কিছুই নয়?"

"অনেক কিছুই। কিন্তু—।" জ্যোতি থেমে গেল। অরবিন্দ মজুমদার তার কাঁধের উপর মুখ ঝুঁকিয়ে দিলেন।

"কিন্তুটা কি?"

"টাকা বা খ্যাতিটাই সব কিছু নয়।"

অরবিন্দর মুখে সকালের রোদের মত ছড়িয়ে পড়ল হাসি। জ্যোতির পিঠে চাপড় মেরে বললেন, "তাহলে বললি কেন হেরে যাচ্ছি? টাকা আর খ্যাতির বাইরেও মস্ত একটা জীবন আছে, এটা তো এবার বুঝতে পারছিস। সেই জীবনে গিয়ে এবার খেল, জেতার চেষ্টা কর। জীবনে অনেক ট্রফি ছড়িয়ে রয়েছে, শুনে

www.BanglaBook.org

শেষ করতে পারবি না।"

"জানেন অরবিন্দদা, সেদিন বিপিনস্যারকে বড় মুখ করে বলেছিলাম, আমার খেলাই আমার সব কিছু, গোটা অস্তিত্ব। মানুষকে আনন্দ দেওয়াই আমার কাজ, তারও একটা গুরুত্ব সমাজে আছে। হাওয়াভরা ওই গোল জিনিসটাই আমার ভগবান। তখন জানতাম না কয়েক মাসের মধ্যেই আমার ভগবান চুপসে যাবেন। বড় বড় কথা আর চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের যে কত পার্থক্য!"

"জ্যোতি, বাঁদিকে একতলা গোলাপি বাড়িটা হেল্‌থ সেন্টার, ওর উল্টোদিকেই ডানদিকের সরু রাস্তাটায় নামবি। ওই যে আমগাছগুলো, ওর পেছনেই আমার বাড়ি।"

কথামত জ্যোতি বাইকটা ডান দিকে ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে নেমে কাঁচা পথ ধরল, আম বাগানের পাশ দিয়ে একতলা একটা বাড়ির সামনে এল। বাড়িটা খুবই পুরনো। দেয়ালে সম্প্রতি কিছু কিছু জায়গায় পলেস্তারা করা হয়েছে। ছাদে পাঁচিল নেই। বাইরের দিকে দুটো দরজা, তার সামনে টানা খোলা সিমেন্টের দালান। তারপর নিচু পাঁচিল ঘেরা মাটির উঠোন যাতে একটা ভলিবল কোর্ট হতে পারে। উঠোনের ধারে ধানের গোলা, কাগজি লেবু, লঙ্কা, গাঁদা, জবা, স্থলপদ্ম ইত্যাদির গাছ। এক প্রৌঢ়া কাজের লোক উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। রান্নার কাঠের জন্য একটি লোক কুড়ুল দিয়ে একটা গুঁড়ি ফাড়ছে। ছ'সাত বছরের একটি ছেলে কুড়ুল চালনা দেখছে একমনে।

দালানে ইজিচেয়ারে বসে প্রভাতী। মোটরবাইকের শব্দ শুনে কৌতূহলে মুখ তুলে রয়েছে। পাঁচিলের ফটকের সামনে জ্যোতি বাইক থামিয়ে ভিতরে তাকিয়ে বলল, "বৌদি কেমন আছেন, অরবিন্দদা?"

"একই রকম।" অরবিন্দ বাইক থেকে নেমে কাঠের ফটকটা খুলতে খুলতে হেসে বললেন, "তোর বৌদিকে সব বলেছি।"

"কি বলেছেন?"

"রিপন স্ট্রীটে ধরাপড়ার কথা।"

"সে কি! কেন বলতে গেলেন?" জ্যোতি ক্ষুব্ধ চোখে তাকাল। তার মনে হল, অরবিন্দদা এই সততা দেখিয়ে স্ত্রীর মনের উপর অত্যাচার করেছেন। ব্যাপারটা চেপে গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না। "এটা আপনার বাড়াবাড়িই বলব।"

"প্রভাতী চোদ্দ বছর পঙ্গু হয়ে রয়েছে। ও নিজেই আমাকে যেতে বলত। আমি কয়েক বছর ধরেই যাচ্ছিলাম। প্রভাতী তা জানে। পুলিস রেইড আগেও

হয়েছে। ধরা পড়েছি, চিনতে পেরে ছেড়েও দিয়েছে। দরকার পড়লে দাশুকে ফোন করে ছাড়া পেয়েছি।"

দালান থেকে প্রভাতী চেঁচিয়ে বলল, "জ্যোতি না?"

"হ্যাঁ বৌদি, আমি।" "জ্যোতিও চেঁচিয়ে উত্তর দিল। তারপর অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে সেদিন দাশুদাকে ফোন করলেন না কেন?"

"করেছিলাম।" ফটকের খোলা পাল্লাটা এক হাতে ধরে রেখে তিনি বললেন, "ভেতরে আয়। পুলিশ রেইডটা দাশুই করিয়েছিল। খবরের কাগজে যাতে ভাল করে ছাপা হয় সে ব্যবস্থাটাও করেছিল।"

"জানলেন কি করে?"

জ্যোতি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অরবিন্দর মুখের দিকে। কুড়ুল চালানো থামিয়ে লোকটি অবাক হয়ে মোটরবাইক দেখছে। বাচ্চা ছেলেটি গুটিগুটি এগিয়ে এসে ফটকের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ফিসফিস করে সে অরবিন্দকে বলল, "দাদু, এটা কি?"

"এটাকে বলে মোটরবাইক।" ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে কথাটা বলে অরবিন্দ তাকাল জ্যোতির দিকে। "আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবার জন্য গাড়িতে উঠে দাশুই আমাকে বলেছিল। সারথি থেকে আমি যাতে বিদায় নিতে বাধ্য হই সেজন্যই ও এই কাজটা করেছে। ও জানত আমি আর কিছু সারথিকে দিতে পারব না। পরিবেশ, মানসিকতা সব কিছুই বদলে গেছে, আমি এখন মিসফিট। এখন এইসব ছেলেদের নিয়ে সাকসেস পেতে হলে অন্যভাবে খেলাতে হবে, অন্য ধরনের কোচ চাই। কিন্তু ক্লাবের বড় একটা গোষ্ঠী আমাকেই রাখতে চায়। এই কাণ্ডটা করিয়ে দাশু তাদের—" অরবিন্দ অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

"জ্যোতি ভেতরে এসো, অনেক দিন দেখি না তোমায়।" প্রভাতী আবার চেঁচিয়ে বললেন।

"যাই বৌদি।"

বাইক নিয়ে জ্যোতি ভিতরে ঢুকল। ধানের গোলার কাছে বাইকটা রেখে সে প্রভাতীর কাছে এগিয়ে এল। প্রণাম করে দালানের কিনারে বসল পা ঝুলিয়ে।

"পথ চিনে আসতে অসুবিধে হয়নি?" প্রভাতী হাসিমুখে জানতে চাইলেন।

"অরবিন্দদার কোচিংয়ে গোলের পথ যে চিনেছে তার পক্ষে রাজপুরের পথ চেনাটা কোন ব্যাপারই নয়।"

"নিশ্চয় ভোরে বেরিয়েছ, পেটে কিছুই এখনো পড়েনি।"

"সত্যিই খিদে পেয়েছে বৌদি।"

www.BanglaBook.org

"আমি দেখছি।" অরবিন্দ ব্যস্ত হয়ে বললেন। "জ্যোতি, মুড়ি খাবি নারকোল দিয়ে?"

"তার সঙ্গে খেজুরগুড় যদি থাকে!"

"গুড় নেই, বাতাসা আছে। মাছ ধরিয়ে তারপর ভাজা খাওয়াব। এখানে এর বেশি আর কিছু দিতে পারব না।"

"আমি এর বেশি আর চাইও না।"

ফটকের কাছে চার-পাঁচটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলভরে বাইকটার দিকে তাকিয়ে। যে ছেলেটি অরবিন্দর কাছে জানতে চেয়েছিল 'দাদু এটা কি?', সে বাইকটার গায়ে হাত দিয়ে ভয়ে ভয়ে জ্যোতির দিকে তাকাল। প্রভাতী চেঁচিয়ে বললেন, "হাত দিও না বুড়ুম, পড়ে যাবে।"

"দিক হাত, পড়বে না। অরবিন্দদাকে দাদু বলল, নাতি নাকি?"

প্রভাতী হাসলেন। "এই পাশেই থাকে। হেল্‌থ সেন্টারে ওর মা কাজ করে। যখন ডিউটিতে যায় তখন এখানে ছেলেকে রেখে যায়।"

জ্যোতির মাথার মধ্যে হেলথ সেন্টার শব্দ দুটো পুকুরে ঢিল ফেলার মত কাজ করল। স্মৃতির কিছু তরঙ্গ তাতে কেঁপে উঠল। জ্যোতি ছেলেটির দিকে আর একবার কেন যে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তা সে নিজেই জানে না।

"জ্যোতি, তোমার খবর কি, খেল্‌ছ কেমন? আমরা তো এখানে খবরের কাগজ রাখি না তাই কিছু জানি না। রেডিও আছে, তাতেই যতটুকু খবর পাই।"

"আপনাদের অসুবিধা হয় না?"

"প্রথম প্রথম হত, এখন হয় না। এখানকার সবকিছুর সঙ্গে এখন আমরা মিলেমিশে গেছি। বড় শান্ত এই জায়গাটা। পাখির ডাক শুনতে পাই, বাতাসের শব্দও শোনা যায়। এমন কি গাছের পাতায় রোদ পড়ে রঙ বদলে গেলেও চোখে পড়ে। খুব শান্তিতে আমরা আছি।"

"এই শান্তি থেকে আমাকে একটু ভাগ দেবেন বৌদি?"

জ্যোতির গলার স্বরে কি যেন একটা শূন্যতা রয়েছে যেটা প্রভাতীর কানে ধরা পড়ল। বললেন, "তোমার কি কিছু হয়েছে?"

"হয়েছে, সেটা ফুটবল আর ক্লাব সংক্রান্ত। এই পরিবেশ দূষিত হয়ে যাবে সেসব কথা বললে, তাই আর বলব না। শুধু এইটুকুই এখন বলব, আমি পালাতে চাই, বৌদি, এখন আমি মাঠ থেকে পালাতে চাই।"

"দিদা!" বুড়ুম কাছে এসে প্রভাতীকে বলল, "আমি ওই গাড়িটার ওপর একবার উঠব?"

"ওটা আমার গাড়ি নয়, এনার। উঠতে হলে এনার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।"

বুড়ুম জ্যোতির দিকে তাকাল। পরস্পরের দিকে নীরবে চোখে চোখ রেখে দুজনে তাকিয়ে রইল। তখন জ্যোতির স্মৃতিতে আবার কয়েকটা ঢেউ কেঁপে উঠল। বুড়ুমের চোখের চাউনিতে খুব চেনা একটা ছায়া যেন ভেসে রয়েছে।

"তুমি বাইকে চড়বে?"

"হ্যাঁ।"

"চলো তোমায় বসিয়ে দি।"

জ্যোতি উঠে দাঁড়িয়ে বুড়ুমের হাত ধরে বাইকের কাছে গেল। দু হাতে ওকে তুলে সীটের উপর বসিয়ে দিয়ে হঠাৎই সে জিজ্ঞাসা করল, "বাড়িতে তোমার কে আছেন?"

"মা।"

"আর?"

"গোপালের মা···আমি এই দুটো ধরব, তুমি যেভাবে ধরেছিলে।"

বুড়ুমের দুটো হাত হ্যাণ্ডেলের উপর বসিয়ে দিয়ে জ্যোতি আবার জিজ্ঞাসা করল, "আর কে আছেন?"

বুড়ুম বিভ্রান্ত চোখে তাকাল জ্যোতির দিকে।

"আর কেউ তো নেই। দাদু তো মরে গেছে!"

"বাবা?"

"ওরে জ্যোতি, আয়।" অরবিন্দ ডাক দিলেন। দালানে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কাঁসার থালা। "বুড়ুম, মুড়ি খাবি তো আয়।"

"না, খাব না।" বুড়ুম উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

জ্যোতি ফিরে এসে মুড়ির থালাটা নিয়ে দালানে বসে বলল, "ছেলেটার বাবা নেই বুঝি?"

অরবিন্দ আর প্রভাতী মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। জ্যোতি সেটা লক্ষ্য করেই খাওয়ায় মন দিল।

"বাবা নিরুদ্দেশ। মা আর ছেলে, শুধু এই দুজনই।" প্রভাতী বললেন।

"তুই ক'দিন থাকবি তো?" অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করেই জুড়ে দিলেন, "একটু অসুবিধে হয়তো হবে, তবে ভালও লাগবে।"

জ্যোতি মুখ নীচু করে মুড়ি খেয়ে যাচ্ছে, জবাব দিল না। নিরুদ্দেশ শব্দটা তার মাথার মধ্যে গুনগুন করে যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

"জানো, জ্যোতি বলল আমাদের শান্তি থেকে ওর একটু ভাগ চাই। কিন্তু ভাগ নিতে হলে তো ওকে এখানে এসে থাকতে হবে!"

"বাহ্, আমরা এত কষ্ট করে, আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে, ভাল খাওয়া ভাল পরা সব ত্যাগ করে যা অর্জন করলুম, তাই থেকে ওকে ভাগ দেব কেন? জ্যোতি নিজের জন্য নিজেই যোগাড় করে নিক। কি রে, তাই তো হওয়া উচিত।" অরবিন্দ মিটমিট হাসছেন।

"আচ্ছা, ওর মার নাম কি?" আচমকা জ্যোতি বলল।

"কেন? মার নাম দিয়ে তোর কি দরকার?" অরবিন্দর চোখ সরু হয়ে গেল।

"আচ্ছা অরবিন্দদা, আপনার কাছে আমি প্রথম হাজির হয়েছিলাম যেদিন আপনার কি সেদিনের কথা মনে আছে?"

"সারথির টেন্টে তো? তোকে ডেকে পাঠিয়ে এনে বলেছিলুম সামনের বছরই সারথিতে চলে এস। হ্যাঁ, মনে আছে। তুই বললি ভেবে দেখব।"

"না না, ওই দিনের কথা নয়। যেদিন সল্ট লেকে আপনার ফ্ল্যাটে প্রথম গিয়ে হাজির হই।"

"মনে আছে। তোকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছিল। প্রথমেই বললি, সারথিতে আমি খেলব। আর আমি বাড়ি ফিরব না, আমায় কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিন। শুনে আমার অবাকই লেগেছিল।"

"আজও আবার সেই আপনার কাছে এসেছি। পালিয়ে এসেছি। সেদিনও আপনার কাছে গেছলাম একজনের কাছ থেকে পালিয়ে। কেন জানি এই মুহূর্তে তার কথাই মনে পড়ছে। আমার এই পালানো ব্যাপারটা শেষ করা দরকার।"

বুড়ুম বাইক থেকে নামার চেষ্টা করছে। দেখতে পেয়ে জ্যোতি থালা রেখে উঠে দাঁড়াল। "দাঁড়াও দাঁড়াও, বাইক আর তুমি দুজনেই পড়বে।"

জ্যোতি এগিয়ে গিয়ে বুড়ুমকে নামাবার সময় মৃদুস্বরে বলল, "তুমি এটায় চড়ে ঘুরবে?"

ফ্যালফ্যাল করে বাচ্চা ছেলেটির তাকিয়ে থাকা দেখতে দেখতে জ্যোতির বুকের মধ্যে কাঁপন ছুঁয়ে গেল। বুড়ুম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এমন সৌভাগ্য তার হবে! সে মাথাটা শুধু হেলাল।

"কোথায় যাবে বলো? মার কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"মা কোথায় এখন?"

"কাজে গেছে। হেল্‌থ সেন্টারে।"

"মার নাম কি ?"

"উষা।"

অরবিন্দ এবং প্রভাতী তাকিয়ে ছিলেন দুজনের দিকে। বাইকের পিছনে বুড়ুমকে বসিয়ে জ্যোতিকেও উঠে বসতে দেখে অরবিন্দ চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যাই অ্যাই, এখন আবার বুড়ুমকে নিয়ে কোথায় ঘুরতে বেরোচ্ছিস, পরে যাস্।"

"ঘুরে আসছি অরবিন্দদা। বৌদি, নিজের জন্য শান্তি নিজেই যোগাড় করতে পারি কিনা সেটাই এবার দেখতে যাচ্ছি।"

বাইক স্টার্টের প্রচণ্ড গর্জনে বুড়ুম ভয় পেয়ে জ্যোতিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

॥ চোদ্দ ॥

দরজার পাশে 'বহির্বিভাগ' লেখা একটা টিনের পাতে। ময়লা নীল হাওলুম পর্দাটা একটা ঠেঁটো লুঙ্গির মত দরজার সামনে দড়িতে ঝুলছে। ঘরের মধ্যে অনেক লোক। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জ্যোতি। তার বাঁদিকে লম্বা একটা করিডোর, একধারে পর পর তিনটে দরজা। ভিতরে কয়েকটি খাটে রোগীদের সে দেখতে পাচ্ছে। বুড়ুম তার ডানদিকের পর্দা ঝোলানো ঘরটাতেই এখন ঢুকেছে।

"তুই! এখন? এখানে?···কি করে এলি?"

জ্যোতির মনে হল এই ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর তার চেনা। সে অস্বস্তি বোধ করল।

"কাজের সময়····· কার সঙ্গে এসেছিস?"

বুড়ুমের জবাবটা জ্যোতি শুনতে পেল না। বোধ হয় ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। তার মনে হল, ভিতরে গিয়ে এখন বোধ হয় ওর মাকে বললে ভাল হয়—আমিই ওকে নিয়ে এসেছি, আবার সঙ্গে করে বাড়িতে পৌঁছে দেব।

"বাইকে চড়ে? কার বাইক, কে তিনি?···স্যার, আমি একটু দেখে আসছি। কি ঝঞ্ঝাট যে এই ছেলেকে নিয়ে হয়!"

পর্দা সরিয়ে উষা বেরিয়ে আসতেই জ্যোতির বুকে একটা ধাক্কা লাগল। উষা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে। বুড়ুম মুখ তুলে দুজনের মুখভাব লক্ষ্য করছে।

"কি ব্যাপার!" উষা দ্রুত ধাতস্থ হয়ে গম্ভীর গলায় জানতে চাইল।

"অরবিন্দ মজুমদারের বাড়িতে এসেছি। উনি আমার গুরু, পিতৃতুল্য। সেখানেই বুড়ুমের সঙ্গে আলাপ। ওকে বাইকে চড়িয়ে একটু ঘোরাবার জন্য বেরিয়ে, এখানে এসে পড়লাম।" জ্যোতি কৈফিয়ৎ দেবার মত কথাগুলো বলেই হাত বাড়িয়ে বুড়ুমকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "মাকে দেখা হল তো, চলো

www.BanglaBook.org

এবার।"

জ্যোতি হাসার চেষ্টা করল। সাত বছর বয়স বেড়েছে উষার। কত বয়স এখন? চব্বিশ, পঁচিশ বড়জোর। মুখটি ভরাট হয়েছে। কাঁধ, গলা, হাত আগের থেকেও সুডৌল। কোমরে বেল্টের বাঁধন থেকে জানা যাচ্ছে ক্ষীণকটি। কিন্তু ওর চোখ দুটিতে প্রচুর বয়স জমা হয়েছে। দুই ঠোঁট কঠিন মনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বুড়ুমকে নিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই জ্যোতি ঘুরে দাঁড়াল। উষার কাছে এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল, "বুড়ুম আমার ছেলে?"

শোনামাত্রই উষার চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে গেল। চাহনি দপ্ করে উঠল। কিন্তু অসম্ভব শান্ত স্বরে বলল, "বুড়ুম আমার ছেলে, ওর বাবা নেই।" তারপরই সে এগিয়ে গিয়ে ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

ভিতর থেকে জ্যোতি শুনতে পেল একটা ক্রুদ্ধ স্বর, "যার-তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া···চুপ করে এখানে বসে থাক্।"

জ্যোতি ছুটে এসে তার বুলেটে চড়ে স্টার্ট দিল। অরবিন্দদার কাছে আবার তাকে সেইভাবে হাজির হতে হবে, সাত বছর আগে যেভাবে সে সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছিল।

দুজনেই অবাক হয়ে শুনে গেলেন।

"এত ব্যাপার! কই, কখনো তো আমায় কিছু বলিস নি?" অরবিন্দ অনুযোগ নয়, তাঁর বিস্ময়কেই প্রকাশ করলেন।

"বলার মত ব্যাপার কি?"

"বলছ কি জ্যোতি, বুড়ুম তোমারই ছেলে? কি অদ্ভুত যে ব্যাপার, কি আশ্চর্য যোগাযোগ!" প্রভাতী অবাক হওয়ার শেষ প্রান্তে এসে গেছেন।

"অরবিন্দদা, আমি বিয়ে করব। এখানে, এখনি। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। অনেক কিছুই তো আমার জন্য করেছেন, এটাও আপনাকে করতে হবে।"

"তুই তো চাস, কিন্তু উষা কি চায়? তোর কথা শুনে মনে হল ও তোকে মন থেকে মুছে ফেলেছে। সাত-সাতটা বছর যথেষ্ট সময় একটা লোককে ভুলতে, সাত মিনিটেও তো ভুলে যাওয়া যায়। এই সাত বছরে তোর জন্য ওর মনে কত যে ঘৃণা জমেছে!"

"জ্যোতিকে ভুলে গেছে বলছ কেন?" প্রভাতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাঁর কোমল স্বরে দৃঢ়ভাবে বললেন, "যতবার উষা বুড়ুমের দিকে তাকিয়েছে ততবারই

জ্যোতিকে মনে পড়েছে। ভোলা কি এত সহজই?"

"বৌদি, কাল অনেকগুলো লোক আমার জন্য মরেছে। আমি সারারাত দগ্ধে মরেছি। আমি পালিয়ে এসেছি এখানে। আমি আর মাঠে ফিরতে পারব কিনা জানি না।" জ্যোতির গলায় গোঙানির মত আওয়াজ। ভয়ার্ত চোখে সে প্রভাতীর দিকে তাকিয়ে।

"ফিরতে পারবি না বলছিস কেন? নিশ্চয় পারবি। জীবনে কি মাঠ শুধু একটাই? সাতটা বছর একটা সহায়সম্বলহীনা মেয়ে লড়ে গেছে, এখনো যাচ্ছে। তোর ফুটবল মাঠের লড়াইয়ের থেকে এটা কম কিসে? দাঁড়া, তোর কোচকে এবার ধরে আনি।"

অরবিন্দ মোড়া থেকে উঠে বাড়ির ভিতরে গেলেন। জ্যোতি উবু হয়ে বসেছিল দালানে। এখন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ চেপে রইল। প্রভাতী তার কাজের স্ত্রীলোকটিকে ডেকে রান্নার নির্দেশ দিতে লাগলেন।

পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অরবিন্দ ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রভাতী মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক স্বরে বললেন, "কোথায় চললে এখন?"

"হেল্‌থ সেন্টারে।" বলতে বলতে অরবিন্দ দালানের সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নেমেছেন তখন প্রভাতী ডাকল।

"কি বলবে ওকে?"

"বলব আর কি, এখন তো বোঝাব। মানুষ ভুল করে, ভুলের খেসারতও দেয়। জ্যোতিকে তুমি মাপ করে দাও, সে অনুতপ্ত, সে—।"

"না।" প্রভাতীর গলায় যে পাথরের মত এমন কাঠিন্য আছে অরবিন্দও তা জানতেন না। তিনি হতভম্বের মত ফিরে তাকিয়ে রইলেন।

"আমাদের নাতিকে নিয়ে বৌমা যেন এখনি তার শাশুড়ীর কাছে চলে আসে, এখুনি। আমাদের ছেলেকে কষ্ট দেবার অধিকার তার আছে কিনা সেটা আমি দেখতে চাই। আমি পঙ্গু বটে কিন্তু মরে যাইনি। বলে দিও আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি। সে সাত বছর লড়েছে, আমি কত বছর?"

জিজ্ঞাসু চোখে প্রভাতী নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর দিকে। অরবিন্দর মুখের উপর দিয়ে ভেসে গেল মমতা, ভালবাসা, বন্ধুত্ব আর শ্রদ্ধার ছায়া। কি একটা কথা বলতে গিয়েও বললেন না। শুধু জ্যোতির দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে প্রভাতীকে দেখালেন আর বললেন "জীবনটা কি বিশাল দেখেছিস!"

অরবিন্দ বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় জ্যোতি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মত প্রভাতীর কোলে মুখ গুঁজে দু'হাতে পা জড়িয়ে ধরল। তারপর বহুদিনের জমানো

www.BanglaBook.org

কান্না বার করে দিতে শুরু করল। প্রভাতীর হাত এসে পড়ল জ্যোতির মাথায়। অস্ফুটে তিনি বললেন, "পুরুষমানুষদের কিছু কিছু ভুল করতে দিতে হয়।"

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। ইজিচেয়ারে পিছনদিকে মাথা হেলিয়ে প্রভাতী আকাশের দিকে তাকিয়ে। তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে জ্যোতি। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুলে উঠছে তার পিঠ।

হাল্কা শব্দ হল ফটক খোলার। প্রভাতী মাথা নামিয়ে তাকালেন। ফটকে দাঁড়িয়ে উষা। তিনি স্মিত চোখে হাসলেন। কুণ্ঠিত পায়ে উষা এগিয়ে আসতে আসতে আঁচলটা মাথায় তুলে দিল।

"শ্বশুর আর ছেলে কোথায়?" জ্যোতির ঘুম যাতে না ভাঙ্গে সেজন্য প্রভাতীর স্বর নিচু।

"এখানকার পুরুতমশায়ের বাড়িতে গেলেন বুড়ুমকে সঙ্গে নিয়ে।" প্রণাম করার জন্য উষা নীচু হয়ে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখল প্রভাতীর পায়ের পাতা আঁকড়ে রয়েছে জ্যোতির হাত। হাতের উপর উষা হাত রাখল।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG